বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ির ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে খোদিত নাসিক-গুহালিপিতে এবং সম্রাট্ খারবেলের হাথীগুম্ফা-লিপিতে নাট্যাভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুলমায়ি উৎসব-সমাজের দ্বারা প্রজাবৃন্দের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। 'গন্ধর্ব-বেদবুধ' রাজা খারবেল[৬] ও তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে রাজধানীর সকলকে উৎসব-সমাজ করিয়া আনন্দ দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটক কতকগুলি নিয়মে বাঁধা। তবে তাহাতে কলা-কৌশল বিশেষভাবে সম্পাদিত। নাটককারকে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিতে হয়। নাটক রচনা-বিধির জন্য নাট্যশাস্ত্র নামে বিশেষ শাস্ত্র আছে। অভিনয়-কার্য্যে দক্ষ ব্যক্তির কিরূপ গুণ থাকা উচিত, নাটকের ভাষা এবং বাক্‌ছন্দ (style) কিরূপ হইবে এবং নাটকের আখ্যানবস্তু (plot) কিরূপ হইবে, নাট্যশাস্ত্রে তাহার বিশেষভাবে উপদেশ আছে। বাস্তব জীবনের যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করা সংস্কৃত নাটকের উদ্দেশ্য নহে। সংস্কৃত নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য—রসের অবতারণা করা। সুকৌশলপূর্ণ ভাষা এবং হাবভাবের দ্বারা রসের অবতারণা করিতে পারিলেই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত নাটক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে রসজ্ঞ হইতে হয়।

সংস্কৃত নাটকের বয়স নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কোন্ সময়ে কিভাবে নাটকের জন্ম হইল, তাহা বলা সহজ নহে। সাহিত্যে নাটককে যে আকারে দেখা যায়, তাহা নাটকের পূর্ণ যৌবনের অবস্থা। শৈশবে যে নাটকের কিরূপ আকার ছিল, সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে মনে হইত, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক। মৃচ্ছকটিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের রচনা বলিয়াই অনেকের ধারণাও ছিল। কিন্তু Sylvain Levi-র Le Theatre indien বাহির হইবার পর হইতে মৃচ্ছকটিকের বয়স সম্বন্ধে এ ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন লোকে মৃচ্ছকটিকের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। তবে সাহিত্যে যতগুলি নাটক পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই নাটকখানি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের লেখা। ইহার প্রণেতা কালিদাস—বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের কবি। বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল

৬। Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 1917, p. 455.

৩৭৫ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পূর্ব্বেও যে ভাল ভাল নাটকের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা ঐ নাটকে কালিদাসই স্বীকার করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পূর্ব্বে, ধাবক, সৌমিল্ল, কবিরত্ন প্রভৃতি নাটককারের যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনা পাঠেই জানিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত এই নাটককারদিগের মধ্যে কাহারও একখানি সম্পূর্ণ নাটকও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, দাক্ষিণাত্যবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পুরাতন পুস্তকাগারে ভাস-প্রণীত নাটকের দশখানি হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। পরে আরও কয়খানি আবিষ্কৃত হয়। কবি ভাসের রচনাভঙ্গী অপূর্ব্ব। ভাসের কোন নাটকে নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক বিধিনিষেধের সহিত তাঁহার পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁহার পরিভাষা তাঁহার নিজস্ব। ভাসের সময় এখনও স্থির হয় নাই। কেহ তাঁহাকে খৃষ্টের পূর্ব্বে বা পরে ফেলিতেছেন। কিন্তু তিনি খৃষ্টের অন্ততঃ তিন-চারি শত বৎসরের যে প্রাচীন অন্য প্রমাণ ছাড়িয়া দিলেও তাহা তাঁহার ভাষা প্রমাণ করিয়া দিবে। ভাস যদি খৃঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পরবর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখায় রাশি রাশি অপাণিনীয় পদ থাকিতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতের প্রথম নাটক কি তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কবি ভাসের পূর্ব্বের কোনও নাটক এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ-যুগের কয়েকখানি নাটকের আবিষ্কার হইয়াছে।* এই নাটকগুলি সম্পূর্ণ নহে। তালপত্রের হস্তলিখিত পুঁথির বিক্ষিপ্ত অংশমাত্র। এগুলি প্রাচীন কুষাণ-যুগের। সে সময়ে মধ্য-এশিয়া কুষাণ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই প্রাচীন নাটকগুলির মধ্যে কুষাণরাজ কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ-রচিত "শারিপুত্র প্রকরণ" বা "শারদ্বতীপুত্র প্রকরণ" নামে একখানি নবাঙ্ক বৌদ্ধ নাটকের তালপত্র-লিপি কিছুকাল পূর্ব্বে তুর্ফানে (Turfan) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নাটকখানির অস্তিত্ব পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না। তরুণবয়স্ক মৌদ্গল্যায়ন ও

* Koeniglich Preussische Turfan-Expeditionen : Kleinere Sanskrit Texte. Heft 1. Bruchstuecke buddhhistischer Dramen herausgehen von Heinrich Lueders, Berlin. 1919, Das Sariputra prakarana, 1911.

শারিপুত্র কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন, এই নাটকে তাহাই বিবৃত আছে। "শারিপুত্র প্রকরণে" নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম বেশ বজায় আছে। গ্রন্থখানি একটী প্রকরণ। প্রকরণের নায়ক ধীরপ্রকৃতির সদ্ব্রাহ্মণ, মৌদ্গল্যায়নও ঐরূপ ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব তাঁর দুই শিষ্য, কৌটিল্য ও একজন শ্রমণ গদ্যে পদ্যে সংস্কৃতভাষায় কথা বলেন, বিদূষকের ভাষা প্রাকৃত। অশ্বঘোষ এই প্রকরণে বিদূষকের অবতারণা করিয়া নাট্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অশ্বঘোষের পূর্ব্বেই নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম তৈরী হইয়াছিল। আর নাট্যকার সেগুলির ব্যভিচারও করিতেন। অশ্বঘোষ কেবল "অতঃপরম্ প্রিয়মস্তি" প্রশ্নে উত্তরব্যঞ্জক ভরতবাক্য দেন নাই, কিন্তু এটুকুতেই তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকের দুইখানি তালপত্রের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ক

১—মহতী খল্বস্য প্রাথিতো [র] থঃ চ হৃদয়গতঃ সম্ব(ৎ)স্ত (ৎ)…

২—পুন্নান অঞ্জলিমপি করয়মানা ন জীবন্তি—ধানং—শারদ্বতী

৩—যন্তমিব—ধানং—ন মে প্রিয়ং যচ্চক্রবাকমিথুনস্য…

৪—ভোতি—নায়—শি দাসপুত্র—ধানং—নহু কো হেতুঃ কল [হ]

খ

১—প্র, প, প্র, স্ত, র [f] নঃ স্বতেন গ, য়, ণ চিত্রগুহনাতপে নিয়ষ্ট।

২—[রম] ণীয়ংণ কারণং ন ঘ ব্যাকটৈয়ী কলহস্ত বিয় নিসিস্রীকা উপ্…

৩—য, পারাবতমিথুনস্য ব্ ক্রহি কথ বিগ্রহো জাতঃ—নায়—শৃণু…

৪—তিবাহ প্র [ী] তি সংহৃতবচনামেনান্ [ন] ত্রাবণগতাং মন্ত্রমানন্তকীম্।

তুর্ফানের আরও দুইখানি নাটকের বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু নাটক দুইখানি নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং তাহাদের বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে নাটক দুইখানির নাম পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারা যায় নাই। ইহার একখানি নাটক রূপক—কতকটা কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র ধরণের। এই রূপক-নাটকের পাত্র-পাত্রী, বুদ্ধি-ধৃতি, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের শান্তি, শ্রদ্ধা, বিষ্ণুভক্তি, সরস্বতী প্রভৃতির অনুরূপ। এই নাটকেরও কিয়দংশ পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল—

সম্মুখভাগ

১—ষ, ভবনিবর্ত্তকেষু ক্লেষেষু ন কিঞ্চিদস্তি প. প্রহন্তেব্যং যস্ত নিত্যমনিত্য [ং] ব [া] ন [ি] ক [ি] ঞ্চদ [ি] স্ত বোদ্ধব্য [ং]—ত, ম, য, ন, ক্ষ, প্ত,[1] ···[ম] [ষ], থ, র, [2]···[র], জ,[3] [য] স্ত [ধ] ব [স] ত[4]

২—যেনাবপ্তম্[5] পরমমমৃতমনুর্ত্ত ভমৃতং মনোবুদ্ধিস্তস্মিংস্নহর্মাভিরমে শান্তি-পরমে—ধৃতি—অস্তি অস্তি তৎ মৎপ্রভাবপরিগৃহীতম্ পুরুষ [ং] জাকস্তেজঃ প্রাচুর্ভূত [ং]—

৩—স [প] রায়ত্তমি[6] [দ] দ্দমিতি যত্র হি বুদ্ধিরবতিষ্ঠতে তত্র ধৃতিঃ স্থায়ং[7] লভতে চ ধৃতিরাধীয়তে তত্র বুদ্ধির্বিস্তীর্য্যতে—কীর্ত্তিঃ—এবং গতে যুবাভ্যামায়[8]

৪—[দ] ানী—ক[9]··· বুদ্ধিঃ তথা ততপি চ—নিত্যং স স্বপ্ত [ই] ব যস্য ন বুদ্ধিরস্তি নিত্যং স মত্ত ইব যো ধৃতিবিপ্রহীন

পশ্চাদ্ভাগ

১—তিষ [ঠ] তি যস [ও] কীর্ত্তিঃ—ক পুনরিদানীং স পুরুষবিগ্রহো ধর্ম্মঃ সম্প্রতি বিহরতি—বুদ্ধিঃ—স্বাধীনায়ামৃদ্ধৌ ক পুনর্ন বিহ···ব ব্যোম্নি যাতি ব্র

২—স [ঙ্] গ [স] ত [য] দ—গাম্প্রবিশতি বহুধা মূর্ত্তিং বিভ [জতি] খে বর্ষত্যম্বুধারাং জ্বলতি চ যুগপৎ সন্ধ্যাম্বুদ ইব স্বচ্ছন্দাৎপর্ব্ব···[ব্] রজতি চ বি [ধিব], [দ]—ধ···[ম্] ম, [এ্] চ চ

৩—[ভ] গোচরঃ—ধৃতিঃ—তেন হি সর্ব্বা যেব তাবদেনং বাসবৃক্ষীকুর্মঃ এষ হি সমহর্ষি—মগধপুরস্তোপবনে সম্প্রতি—সোম্র্যবব্ভ্র ( ) স্তমৃত্জালপাণিপা [দ]

অপর নাটকখানি গণিকা-ব্যাপার লইয়া লিখিত। ইহারও নাম জানিতে পারা যায় নাই।

সংস্কৃত নাটকের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত নাটকে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে শিব বা বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রার্থনা করা একটী সাধারণ

১। তমো যেন ক্ষিপ্তম। ২। ময়ূখৈঃ। ৩। রজো। ৪। যস্ত ধবস্তম্। ৫। আবাপ্তম্। ৬। পরম্পরায়াত্তং। ৭। স্থানং। ৮। আয়ত্তা-ভ্যাং। ৯। ইদানীং ক।

নিয়ম। একখানি নাটকে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই নাটকখানির নাম 'নাগানন্দ'। শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পর অবদানশতকে (সংখ্যা ৭৫) একটী বৌদ্ধ নাটকের কথা পাওয়া যায়। ইহাতে বুদ্ধ কুকুচ্ছন্দ ও শোভাবতীর কথা আছে। ভিক্ষুদেরও কথা আছে। তিব্বতী "কা-গ্যুরে"ও ইহার উল্লেখ আছে। উল্লিখিত অবদানে লিখিত আছে যে, রাজার সম্মুখে বুদ্ধনাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে নাটকাচার্য্য (directors) বুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের কাগজপত্র ফ্লীট সাহেব কীলহর্নের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ঐ কাগজপত্রের সহিত দুইখানি শিলালিপির ছাপ তাঁহার নিকটে গিয়াছিল। কীলহর্ণ ১৮৯১ সালে সেই দুইখানির বিবরণ ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকুয়েরীতে প্রকাশ করেন। এই শিলালিপি দুইটী দুইখানি নাটকের। একখানির নাম "ললিতবিগ্রহরাজ" নাটক, অপরখানির নাম "হরকেলি" নাটক।

'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটকখানি শাকম্ভরীর রাজা বিগ্রহরাজদেবের সম্মানের জন্য লিখিত। নাটকের রচয়িতা মহাকবি সোমদেব। শিলালিপিতে এই নাটকখানির সাঁইত্রিশটী ছত্র পাওয়া যায়। শিলালিপিটী খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নাগরীতে লিখিত। মহীপতিপুত্র ভাস্কর কর্ত্তৃক ইহা ক্ষোদিত। নাটকের ভাষা সংস্কৃত ও কয়েকটি প্রাকৃত। শিলালিপিতে কোথাও সময়ের উল্লেখ নাই। "হরকেলি" নাটকও একই সময়ের অক্ষরের লেখা। ইহাও ভাস্করের দ্বারা ক্ষোদিত। ইহাতে ভাস্করের, আরও একটু বেশী পরিচয় আছে। ভাস্করের পিতা মহীপতি গোবিন্দের পুত্র। এই গোবিন্দের জন্ম হূনরাজবংশে। ভোজরাজ ইহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই লিপিতে তারিখ আছে। "সংবৎ ১২১০ মার্গশুদি ৫ আদিত্যদিনে শ্রবণ নক্ষত্রে মকরস্থে চন্দ্রে হর্ষণযোগে বালবকরণে॥ হরকেলি-নাটকম্ সমাপ্তম্॥ মঙ্গলম্ মহাশ্রীঃ॥ কীর্ত্তিরিয়ং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-শ্রী-বিগ্রহরাজ-দেবস্য॥"—নাটকের শেষে এইরূপ লিখিত আছে।

Annual Report Arch. Surv. of India, 1921-22, (পৃঃ ১১৭) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজকেশরী কুলতুঙ্গের একটী অনুশাসনে "নানাবিধ নাট্যশালা"র ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। তিরুবরিয়ুর নামক স্থানে একটী অভিনয় হইয়াছিল, সেই অভিনয়ে তৃতীয়

রাজরাজ উপস্থিত ছিলেন, অভিনয়কে এখানে 'অগমার্গম' বলা হইয়াছে। প্রথম রাজরাজের নবম বর্ষের একটী অনুশাসনে একজন অভিনেতাকে ভূমিদানের কথার উল্লেখ আছে। এই অভিনেতার নাম কুমারণ সিকণ্টন (কুমার শ্রীকণ্ঠ)। ইনি 'আর্যাকূট্টু' নামক সপ্তাঙ্ক নাটকের অভিনয়ের জন্ম 'সট্টনূর' সমাজ হইতে ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[প্রথম প্রকাশ: প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৬। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।]

ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা

নাট্যশালায় নাটকাদির অভিনয় হয়। এখানে নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাব, ভাব, বিলাস প্রভৃতি চৌষট্টি কলার কয়েকটি কলা-শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশালায় এগুলির অনুশীলন হয়—রসাস্বাদন হয়। এখানে অভিনয় দেখিয়া লোকে আমোদ উপভোগ করে। অভিনেতারাও অভিনয় করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

নাট্যশালা আজকালকার তৈরী একটা নূতন জিনিস নয়। ইহা অতি প্রাচীনকালের সৃষ্টি। ভারত, গ্রীস ও রোম—এই তিন দেশেরই নাট্যশালা খুব পুরানো। চীন ও এশিয়া-মাইনরের নাট্যশালাও কম দিনের নয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নাট্যপদ্ধতির একটি গল্প আছে। ত্রেতাযুগে দেবতারা সকলে ব্রহ্মার নিকটে যান। তাঁহারা তাঁহার কাছে চক্ষু ও কর্ণের সমান প্রীতিপ্রদ কিছু প্রার্থনা করেন। এটি হইবে পঞ্চম বেদ। তবে এখানি যজুর্বেদের মত দ্বিজগণের একচেটিয়া হইতে পারিবে না; শূদ্ররাও ইহার অধিকার পাইবে। ব্রহ্মা তখন কোমর বাঁধিলেন। আবৃত্তি করিবার মত ধাতু লইলেন ঋগ্বেদ হইতে; সামবেদ হইতে গানের উপযোগী অংশ; যজুর্বেদ হইতে লইলেন কুশীলব-কলা, আর রসভাব গ্রহণ করিলেন অথর্ববেদ হইতে। তারপর তিনি বিশ্বকর্মাকে নাট্যশালা নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কলাকে কাজে লাগাইবার জন্ম ভরতকে উপদেশ দিয়া দিলেন। ব্রহ্মার এই অভিনব সৃষ্টি দেবতারা আনন্দে গ্রহণ করিলেন। এইবার নাট্যকলার রচনায় মহেশ্বর ও বিষ্ণুর পালা। শিব দিলেন তাঁর 'তাণ্ডবনৃত্য'। পার্বতীও চুপ করিয়া রহিলেন না—তিনি তাঁর মৃদু নৃত্য 'লাস্ত' প্রদান করিলেন। বিষ্ণু চারিটি

নাটকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া নাট্যকলার প্রবর্ত্তন করিলেন। তখন ভরতের উপর ভার হইল—তিনি নাট্যশাস্ত্ররূপ এই দৈব পঞ্চমবেদ পৃথিবীতে লইয়া যান।

'সঙ্গীত দামোদরে' এই গল্পের একটু রকমফের আছে। এই গল্পে ব্রহ্মার নিকট দেবতারা যান নাই—ইন্দ্রই গিয়াছিলেন। গল্পাংশে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই।

প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা নাট্যপদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। ভরতঋষি ব্রহ্মার প্রণালী অবলম্বন করিয়া বনে ঋষিদের শিক্ষা দেন, নাট্যশাস্ত্রও প্রণয়ন করেন। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় অভিনয় দেখাইবার জন্য তিনি উর্ব্বশী ও মেনকাকে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত শিক্ষা দেন। পৃথিবীতে ইনি নাট্যের প্রথম স্রষ্টকর্ত্তা। তাই নাটকের নাম "ভরত-সূত্র"। নটের নাম "ভরত-পুত্র"। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্য-প্রকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এই গ্রন্থ অভিনয়ের জন্য তিন রকমের নাট্যমণ্ডপের ব্যবস্থা তিনি দিয়াছেন।

'বিকৃষ্টচতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ'—২/৯

(১) 'বিকৃষ্ট'—চতুষ্কোণ (rectangular)

(২) চতুরস্র—সমচতুষ্কোণ (square)

(৩) ত্র্যস্র—ত্রিকোণ (triangular)

আর নাট্যমণ্ডপের পরিমাণও তিন রকমের—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

'তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্॥"—২/৯

বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহ 'জ্যেষ্ঠ' ('জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ম্'—২/১৪)। এটি শুধু দেবতাদের জন্য নিরূপিত ('দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠম—২/১২)। এই প্রেক্ষাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত* (অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠম্' ২/১১)। চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ 'মধ্যম' ('চতুরস্রং তু মধ্যমম্'—২/১৪)। রাজা-রাজড়াদের জন্য এটি নির্দ্ধারিত (নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ—২/১২)। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত (চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্—২/১১)।

---

* আমরা সাধারণত হাত বলিতে যাহা বুঝি তাহা ধরিলে চলিবে না। এ মাপকাঠি অন্য রকম। অণু, রজঃ, বলি, লিখ্যা, যুকা, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড—এই কয়টি দিয়া মাপ করিবার নিয়ম।

১ দণ্ড=৪ হস্ত, ১ যব=৮ যুকা, ১ বলি=রজঃ, ১ হস্ত=২৪ অঙ্গুল, ১ যুকা=৮ লিখ্যা, ১ রজঃ=৮ অণু, ১ অঙ্গুল=৮ যব, ১ লিখ্যা=৮ বালি।

ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহ 'কনিষ্ঠ (কনীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রম্—২/১৪)। ইহা সাধারণ লোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ('শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে'—২/১২)। এই প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবাহুর পরিমাণ ৩২ হাত ('কর্ণয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে'—২/১১)।

লোকে সচরাচর দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও বিস্তারে ৩২ হাত নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করে। লম্বা চওড়ায় ইহার বেশী করা উচিত নয়; প্রেক্ষাগৃহের আয়তন ইহা অপেক্ষা বড় করিলে নাট্য অস্ফুট হইয়া পড়িবে। মণ্ডপ আরও বড় করিলে অভিনেতাদের আওয়াজ কিছুই শোনা যাইবে না। আর শোনা গেলেও শ্রোতাদের কাছে অভিনেতাদের স্বর বিস্বর বোধ হইবে। তাছাড়া অঙ্গভঙ্গী ও দৃষ্টি দ্বারা অভিনেতা যে-সকল দাস্তগত ভাব দর্শকদের দেখাইতে চেষ্টা করিবে, আয়তন অত্যন্ত বড় হওয়ায় দূরস্থ দর্শকদের নিকট সে সমস্ত ভাব অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া পড়িবে; কাজেই প্রেক্ষাগৃহের আয়তন মধ্যম পরিমাণের হওয়া দরকার। আর তাহাতে পাঠ্য ও গান ভালই শোনা যাইতে পারিবে।

তারপর ভরত রঙ্গপীঠ (stage) তৈরী করিবার বিধি করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"ভূমের্বিভাগং পূর্বংতু পরীক্ষেত প্রয়োজকঃ।"
"ততো বাস্তু-প্রমাণেন প্রারভেত শুভেচ্ছয়া ॥"—২, ২৭

প্রেক্ষাগৃহের ভূমিভাগ আগে পরীক্ষা করিয়া বাস্তুপ্রমাণ গৃহারম্ভ করা প্রয়োজন। নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী ভূমি দেখিয়া তাহাতে নাট্যমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ ভূমি পাঁচ রকমের—সম, স্থির, কঠিন, কৃষ্ণ ও শ্বেত।

"সমা স্থিরা তু কঠিনা কৃষ্ণা গৌরী চ যা ভবেৎ।
ভূমিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ ॥"—২, ২৮

তারপর ভূমিকে শোধন করিতে হইবে; লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া অস্থি, কীলক, কপাল, তৃণ ও গুল্মাদি উৎসারিত করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপর

"শোধয়িত্বা বসুমতী প্রমাণং নির্দ্দিশেত্ততঃ।"—২, ৩০

ছেদ নাই এমন রজ্জু দিয়া বিশেষ সাবধান হইয়া ভূমি মাপ করিবার ব্যবস্থা। মাপ করিবার নিয়ম এই—

দড়ি দিয়া মাপিয়া ৬৪ হাত লম্বা জমি করিয়া লইতে হইবে। ইহাই হইবে মণ্ডপের দৈর্ঘ্য। তাহাকে আবার দুইভাগ করিতে হইবে। এই দুইভাগ করা ভাগের পিছনে যে ভাগ থাকিবে তাহাকেও আধাআধি ভাগ করিতে হইবে। ইহারই এক ভাগে 'রঙ্গপীঠ' নির্ম্মাণ করা হইবে।

এইবার মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, শঙ্খাদির ধ্বনি করিয়া গৃহস্থাপন করা হয়। ইহার পর 'ভিত্তিকর্ম্ম'। ভিত্তিকর্ম্ম শেষ হইলে 'স্তম্ভস্থাপন'। শুভ সূর্যোদয়ে আচার্য্যের সাহায্যে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা উচিত। সেই রাত্রে 'বলির' ব্যবস্থা।

নাট্যশালা দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ দর্শকের বসিবার জন্য, অপরভাগ রঙ্গ (stage)—এখানে অভিনয় হয়। দর্শকদের স্থান আবার স্তম্ভ দিয়া চিহ্নিত করা। সম্মুখে সাদা রঙের থাম—নাম ব্রাহ্মণ-স্তম্ভ। এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহ বসিতে পারিবে না। তারপর ক্ষত্রিয়দের জন্য লাল রঙের থাম। উত্তর-পশ্চিমে হলদে রঙের স্তম্ভ—এখানে বৈশ্যরা বসিবে। উত্তর-পূর্ব্বে নীল-কৃষ্ণ স্তম্ভ। এটি শূদ্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

ব্রাহ্মণ-স্তম্ভের নীচে সোনা, ক্ষত্রিয়-স্তম্ভের নীচে তাঁমা, বৈশ্য-স্তম্ভের নীচে রূপা, আর শূদ্র-স্তম্ভের নীচে লোহা দিতে হইবে। কিন্তু সকল স্তম্ভের মূলে লোহা দেওয়া চাই-ই। তারপর রঙ্গপীঠ করিবার নিয়ম। বসিবার আসনগুলি কাঠের ও ইটের। এগুলি থাক্-থাক্ করিয়া সারি দিয়া সাজান থাকিত। সামনে রঙ্গের (stage) পাশে চারিটি স্তম্ভের উপর বারাণ্ডা—এটিও বোধ হয় সম্ভ্রান্ত দর্শকদের জন্য। দর্শকদের সম্মুখে রঙ্গ (stage) চিত্র ও মূর্ত্তি দিয়া সাজান। এটি একটি বর্গক্ষেত্র—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ৮ হাত করিয়া। রঙ্গের শেষ দিকটার নাম—'রঙ্গশীর্ষ'। ইহাও নানা রকম মূর্ত্তি দিয়া সাজান। রঙ্গশীর্ষে ছয়টি কাঠের খুঁটি (স্থাণু) থাকা দরকার। এইখানে রঙ্গদেবতার পূজা হয়। রঙ্গশীর্ষের গর্ত্ত কালো-রঙের মাটি দিয়া ভরাট করা। সেই মাটিতে কাঁকর বা ঢিল-পাটকেল থাকিবার জো নাই।

রঙ্গপীঠ আদর্শতলবৎ করাই নিয়ম—কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত অথবা মৎস্যপৃষ্ঠাকার হইবে না। রঙ্গপীঠের উপরদিকে—মাথায় কতকগুলি রত্ন বসাইতে হয়। যেখানে বসাইতে হয় সেই স্থানের নাম 'রঙ্গশির'। ইহার পূর্ব্বদিকে হীরক, দক্ষিণে বৈদূর্য্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল, মধ্যে কনক দিতে হয়। এই রকম করিয়া রঙ্গশির তৈরী করিয়া তবে তাহাতে কাঠের কাজ করিতে হয়। কাঠের কাজকে 'দারুকর্ম্ম' বলা হইত। কাঠে নানারকম শিল্প-রচনা করিতে

হইত। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানারকম পুতুল, বেদি, বন্ধজালগবাক্ষ, কুট্টিমের উপর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া কাঠের কাজ শেষ করা হইত।

রঙ্গের পিছনে 'যবনিকা'। এটি একটি রঙ্ করা পর্দ্দা। ইহার নাম 'পটি' বা 'অপটি'। আরও দুইটি নাম আছে। 'তিরস্করণী'—'প্রতিশিরা'। যখন একজন তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে, অপরটি বেশ জোরে টানিয়া লওয়া হয়; ইহার নাম 'অপটিক্ষেপ'। যবনিকার রঙ্ সকল সময় লাল হইয়া থাকে। কোন কোন মতে যবনিকার রঙ্, প্রয়োজন অনুসারে নানা রকমের হইত। আদিরসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র, অদ্ভুতরসে হরিৎ, হাস্তরসে বিচিত্র, ভয়ানক-রসে নীল, বীভৎসরসে ধূমল ও রৌদ্ররসে রক্তবর্ণের ব্যবস্থা কেহ কেহ করিতেন। কিন্তু কোন মতে আবার যবনিকা সকল ক্ষেত্রেই লাল। আজকাল অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি অঙ্কের যবনিকা, দিয়া রঙ্গের সম্মুখ ভাগ ঢাকিয়া রাখা হয়। পুরাকালে যবনিকা দুইভাগে বিভক্ত থাকিত। কোন ভূমিকায় অভিনেতার প্রবেশের সময় যবনিকার দুটি খণ্ড দুইটি সুন্দরী কুমারী দুই পাশ দিয়া গুটাইয়া লইত। এখনকার মত কপিকলের সাহায্যে উর্দ্ধে তুলিয়া দেওয়া হইত না। এই সুন্দরীদ্বয়ের কাজ ছিল যবনিকা ধরিয়া রাখা। পর্দ্দার পিছনে 'নেপথ্য-গৃহ'। ইহা সাজঘর—অভিনেতাদের অধিকৃত। নেপথ্য-গৃহ হইতে দৈববাণীর ব্যবস্থা হয়। একসঙ্গে অনেকের উচ্চকণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি এইখান হইতেই করা হইয়া থাকে। যে সকল অভিনেতার রঙ্গে উপস্থিতি অসম্ভব অথবা অনভিপ্রেত তাহাদের কণ্ঠস্বর এইখান হইতেই উচ্চারিত হইত। নেপথ্য-গৃহের দুইটি পীঠদ্বার করিতে হয়। সাজঘর ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে দুইটি দরজা দিয়া সাজঘর হইতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিতে হয়। নেপথ্য বলিতে যদি রঙ্গের অপেক্ষা উন্নত কোন স্থান কেহ বোঝেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। কেননা, ব্যুৎপত্তি অনুসারে (নি-পথ) নেপথ্য বলিতে নিম্নগামী পথই বোঝায়। নেপথ্য রঙ্গাপেক্ষা নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

সাধারণতঃ নেপথ্য রঙ্গের কিছু উঁচু হয়। তাই অভিনেতাদের রঙ্গে প্রবেশ করার নাম 'রঙ্গাবতরণ'। রঙ্গাবতরণ বলিতে সহসা মনে হইতে পারে, যেন কোন উচ্চস্থান হইতে রঙ্গে নামিয়া আসা হইয়াছে। এটি ভুল।

রঙ্গ হইতে নেপথ্যে যাইবার দুইটি দ্বার থাকিত। অর্কেষ্ট্রার স্থান এই দ্বার-দ্বয়ের মধ্যেই ছিল।

"কার্য্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপ।" ২।৬৯

নাট্যমণ্ডপের আকার পর্ব্বতগুহার মত হইত। আর দোতলা (দ্বিভূমি) হইত। দোতলা হইবার সার্থকতা এই যে, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষের অভিনয় উপরের তলায়, আবার মর্ত্তভূমির যা কিছু অভিনয় সমস্তই নীচের তলায় হইত। রঙ্গপীঠের বাতায়ন ছোট ছোট হইত। নহিলে বাদ্যযন্ত্র ও অভিনেতাদের 'গম্ভীর-স্বরতা' নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নির্বাত ধীর শব্দ-স্থান হইতে স্বর গম্ভীরতর হইয়া বাহিরে শোনায়। কাজেই বাতাস বেশী চলা-ফেরা না করিতে পারে এইরূপ করিয়া জানালা তৈরী করা দরকার। প্রাচীর ভিত্তি শেষ হইলে 'ভিত্তিলেপ' (plastering) করা হইত। তারপর চুনকাম করাকে 'সুধাকর্ম্ম' বলিত। ভিত্তি বেশ সমানভাবে মাজাঘসা হইলে তাহাতে নানা রকমের চিত্র, লতাবন্ধ, স্ত্রীপুরুষ রচনা করা হইত।

নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণের এই গেল সাধারণ পদ্ধতি।

তারপর চতুরঙ্গ মণ্ডপের বিশেষ লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চতুরঙ্গ মণ্ডপ চার কোণ, আর চার দিকেই ৩২ হাত। বাহিরের চারদিকে ইটের দেওয়াল রচনা করিয়া, ঘিরিয়া, ভিতরে রঙ্গপীঠ নির্ম্মাণ করা হইত। রঙ্গপীঠের চারিদিকে দশটা স্তম্ভ থাকিত। এই স্তম্ভের বাহিরে দর্শকদিগের বসিবার জন্য আসন তৈরী করা হইত। আসনগুলির আকার হইত সিঁড়ির মত। এগুলি হয় কাঠের, নয় ইটের। এক এক পঙ্‌ক্তি বা সারি অপর পঙ্‌ক্তির চেয়ে এক হাত নীচু করিয়া সাজান হইত।

এই দশটি স্তম্ভ ছাড়া মণ্ডপের অন্যান্য দিকে আর দশটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইত। স্তম্ভগুলির উপর আট হাত পরিমাণ পীঠ নির্ম্মাণ করার রীতি ছিল। ঐ স্তম্ভগুলি শালকাঠের তৈরী। আর সেগুলি স্ত্রীমূর্ত্তি দিয়া অলঙ্কৃত থাকিত। এই ছয়টি স্তম্ভের নাম—'ধারণী-ধারণ।' ইহার নাম নেপথ্য-গৃহ। ইহাতে একটি মাত্র দ্বার। এ ছাড়া রঙ্গের দিকে আর একটা 'জনপ্রবেশে'র দ্বার থাকিত। এই রঙ্গপীঠ সবসুদ্ধ আট হাত। ইহা চতুরস্র ও সমতল। ভিতরে একটা বেদিকা সাজান থাকিত। তার পাশ দিয়া "মত্তবারণী" বাহির করা হইত। মত্তবারণী বেশ চিত্র করা বারান্দা। বারান্দা ধারণ করিবার জন্য চারিটি স্তম্ভের ব্যবস্থা থাকিত। ইহার পর রঙ্গশীর্ষ। ত্র্যস্রমণ্ডপ ত্রিকোণ। ইহার মাঝখানে ত্রিকোণ রঙ্গপীঠ। দরজাও ত্রিকোণ। রঙ্গপীঠের পিছনে আর একটি দরজা থাকিত। সম্মুখে ভিত্তির উপর স্তম্ভ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পর্ব্বতগুহাকারে নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইত।

প্রাচীনকালে গুহা যে নাট্যশালার জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের রায়গড়ের গুহালিপিতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, 'প্রেক্ষাগৃহ' নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্ম্মিত হইত। কখন কখন নাট্যাভিনয়ের জন্যই পৃথক গৃহের বন্দোবস্ত থাকিত। এরূপ ঘরের নাম ছিল 'প্রেক্ষাগৃহ'। পালি-সাহিত্যে ইহার নাম 'পেক্খ'। 'সমন্তপাসাদিকা' ও 'সুমঙ্গল-বিলাসিনী'তে প্রেক্ষা-গৃহ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৭৯২ সালে সরকার বাহাদুরের সুরগুজার উপর প্রথম নজর পড়ে। তখন হইতে উসলী, ডালটন, বল, বেগলার, কানিঙ্‌হাম প্রভৃতি অনেকেই সুরগুজার রামগড় পাহাড় দেখিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন। পরে ডক্টর ব্লথ সুরগুজার রামগড় পাহাড়ে 'সীতাবেঙ্গরা' ও 'যোগীমারা' নামক দুইটী গুহার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। এ দুইটি যে প্রেক্ষাগৃহ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নাট্যশালা যে পর্ব্বত-গুহার আকৃতিবিশিষ্ট হইবে, ইহার উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে আছে।

গুহাতে যে শুধু যোগীরা ধ্যানই করিতেন, তাহা নয়। নাচগান আমোদের জন্য প্রাচীনকালে এগুলির যে ব্যবহার ছিল, কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। অধ্যাপক লুডের্স কতকগুলি এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন (Indian Antiquary, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ১৯৯-২৮০)। ঔরঙ্গাবাদে একটি বৌদ্ধগুহাতে একেবারে মন্দিরেই নাচের যে বন্দোবস্ত ছিল, পাশের ছবিটি দেখিলেই বেশ উপলব্ধি হইবে (Arch. Surv. Western India. Vol. III, pl. liv, fig 5)।

নাসিকেও এই রকম নাচগানের জন্য ব্যবহৃত দুইটি গুহা আছে। আজও গুহা দুইটি দেখিলে দর্শকদের চোখে নৃত্যগীতের দৃশ্য জীবন্তভাবে ফুটিয়া ওঠে। জুনাগড়ের উপরকোট গুহার দৃশ্য আমাদের এই কথাই সপ্রমাণ করিয়া দেয়। কুদা ও মহাড়ের গুহাতেও নাচগানের ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাহাই নয়, দেখা যায়, এই গুহা দুইটির তিনধারে বসিবার আসনের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে এই গুহা-দুইটি সম্ভবত অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। (ফার্গুসন ও বর্জেস-সঙ্কলিত 'Cave Temples' pls, v,l ; XIX, XXVI, &c, এবং Arch. Surv. Western India, Vol IV pls VII—X)। মথুরার একটি প্রাচীন শিলালিপিতে একজন গণিকার দানের একটা ফিরিস্তি আছে। এই গণিকার নাম 'নাদা'। নাদা শিলালিপিতে আপনাকে 'লেনশোভিকাদন্দা'র কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'লেনশোভিকা' শব্দের অর্থ "গৃহাভিনেত্রী"।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংশবধ' ও 'বলিবন্ধ' নাটকাভিনয় প্রসঙ্গে—'যে অভিনয় করে' এই অর্থে 'শোভিকা' শব্দের উল্লেখ আছে, (পাণিনি ৩।১।২৬, বার্তিক ১৫)। গুহাতে শুধু মুনি-ঋষিরা থাকিতেন না, গাণকারা, লেনশোভিকারা—আর তাহাদের প্রণয়াস্পদেরাও থাকিত।

রামগড় গুহায় এইরূপ নাট্যশালার ব্যবস্থা আছে। একটা রীতি আছে যে, রঙ্গালয়ে যক্ষলিপি থাকিবে। এইখানে সীতাবেঙ্গরা গুহাতেও একটি লিপি আছে। খুব সম্ভব তাহা যক্ষলিপি।

সীতাবেঙ্গরা গুহার প্রবেশ-পথের পার্শ্বে গুহার ছাদের ঠিক নিচেই একটি খোদিত লিপি আছে। লিপিটি মাত্র দুই ছত্র। প্রতি ছত্র তিন-ফুট আট-ইঞ্চি লম্বা। এক-একটি অক্ষর প্রায় ২৫ ইঞ্চি। দুইটি ছত্রেরই শেষের দিককার অক্ষরগুলি সিমেণ্টে বুজিয়া গিয়াছে।

ব্লথ সাহেবের ধৃত-পাঠ এইরূপ—

১। অদিপয়ন্তি হৃদয়ং সভাব-গরু কবয়ো এরা তয়ং...

২। দুলে বসংতিয়া হাসাবাহুভূতে কুদস্ফতং এবং অলং গ [ত]।

এই শ্লোকের তিনি যে তর্জমা করিয়াছেন তাহা এই—'Poets Venerable by nature kindle the heart, who—'

'At the swing festival of the vernal full moon, when frolics and music abound, people thus (?) tie (around their necks garlands) thick with jasmine flowers.'

ইহার পর যোগীমারা গুহায় যে-লিপি আছে ব্লথ তাহারও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ এই—

(১) শুতনুক নম

(২) দেবদাশিক্যি

(৩) শুতনুক নম। দেবদাশিক্যি

(৪) তং কময়িথ বল ন শেযে।

(৫) দেবদিনে নম। লুপদখে।

এই কথাগুলির ব্লথ সাহেবের অনুবাদ এইরূপ—

(1) 'Sutanuka by name,

(2) 'A Devadasi

(3) 'Sutanuka by name, a Devadasi,

(4) 'The excellent among young men loved her

(5) 'Debodinna by name, skilled in sculpture.'

উপরে ব্লখ সাহেবের গৃহীত এই সকল লিপির প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

বোইয়ে (A. M. Boyer) কিন্তু উপরের দুইটি লিপির অন্যরূপ পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ নিয়ে দেওয়া হইল—

১। অদিপয়ন্তি হৃদয়ং। স [ধা] ব গ র ক [ং] বয়ো
এতি তয়ং...দুলে বসং তিয়া
হি সাবানুভূতে কুদস্ ততং এব অলং গ [তা]

২। সুতনুকা নম। দেবদাশিক্যি।
তং কময়িথ বলু ন শেয়ে
দেবদিনে নম। লুপ দখে।

[Journal Asiatique, Xieme Ser tom. III Pp. 478]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুইটি লিপির পাঠ অন্যরূপ করিয়াছেন। যদিও তিনি তাঁহার পাঠ দেন নাই, কিন্তু যে অনুবাদ দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার পাঠ যে ভিন্ন তাহা বেশ ধরা যায়। নিয়ে তাঁহার কৃত অনুবাদ দিলাম—

প্রথম লিপির শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজি অনুবাদ—

'I salute the beautifully-formed one who shows us the gods. I salute the beautiful form that leads us to the gods. He is much in quest at Varanasi. I salute the god-given one for seeing his beautiful form.'

দ্বিতীয় লিপির অনুবাদ :—

'The heart of a lady living at a distance (from her lover) is set to flames by the following three—sadam, Bagara and the poet. For her 'this cave is exacavated. Let the God of love look to it."

[J. A. S. B. Proceedings, 1902, Pp. 90-91]

সীতাবেঙ্গরা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, সীতা দেবী এইখানে বাস করিতেন। সীতাবেঙ্গরা গুহা ভিতরের দিকে ছয় ফিট উঁচু। মাঝে-মাঝে ছয় ফুটেরও কম। গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারিপাশ উঁচু বেদি

দিয়া ঘেরা; একটি বড় নালি ঐ বেদির নিম্ন দিয়া দেয়ালের দিকে চলিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর কতকগুলি গর্ত্ত বেশ যত্ন সহকারে কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার ভিতরে প্রবেশের পথ ১৭ ফুট চওড়া। গুহাটি সর্ব্বসমেত ৪৪১ ফুট। মধ্যভাগে ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া। আর প্রায় ৬ ফুট উচ্চ। চারিদিকের দেয়াল কাটিয়া প্রস্তুত। দেয়ালের চারিদিকে পাথরকাটা উচু উচু মঞ্চাসন। তিনদিকে দুই সারি মঞ্চাসন। ভিতরের অংশ বাহিরের অংশের চেয়ে দুই ইঞ্চি উচু। যে-দিকটার সম্মুখ প্রবেশ পথের দিকে দুই সারি মঞ্চের (double bench) সেই দিকটা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। প্রবেশ পথের পশ্চাদ্ভাগের মঞ্চাসনগুলি অপেক্ষাকৃত নিচু; প্রাচীরের দিকে ছোট ছোট পাথর কাটা মঞ্চাসন আছে। এই প্রবন্ধের শেষে (পৃঃ…) ব্লথ প্রদত্ত নক্সা দেওয়া গেল।

এই নক্সা হইতে ইহার অবিকল ধারণা না হইতে পারে। কিন্তু তিনি আর একটি যে-চিত্র দিয়াছেন—তাহাতে চিত্র আরও সুস্পষ্ট। এই চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

প্রথম চিত্রের নিচের দিকের শেষ রেখা মালভূমির প্রান্তদেশ নয়, এখানে জমি কিছু নামিয়া গিয়াছে। ব্লথ বলেন, এই ক্ষুদ্র পাথরকাটা ডিম্বাকার নাট্যশালার সম্মুখে রঙ্গপীঠ (Stage) স্থাপনের জন্য প্রচুর স্থান আছে। আর মঞ্চাসনগুলিতেও পঞ্চাশ-ষাট জন দর্শকের বসিবার জায়গা হয়। অভ্যন্তর দেশ ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া একটি আয়ত চতুরস্রাকৃতি বিশিষ্ট (oblong) স্থান। তিনদিকেই পাথরকাটা সুপ্রশস্ত বসিবার জায়গা; এগুলি ২॥ ফুট উচ্চ, ৭॥০ ফুট প্রশস্ত; সম্মুখভাগ কয়েক ইঞ্চি মাত্র নিচু করিয়া আসনগুলি চাতালের আকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছে। প্রবেশ-পথের নিকটস্থ ভূমি আসনের কোণের ভূমির চেয়ে কিছু নিচু।

১৯০৩-৪ সালের Arch. Servey-র Annual Report-এ (পৃঃ ১২৩-১৩১) ব্লথ সাহেব রামগড় নাট্যশালার সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্র ও নক্সা ব্লথের এই বিবরণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। ব্লথ ১৯০৪ সালে ৩০-এ এপ্রিল তারিখে রামগড়ের রঙ্গালয় সম্বন্ধে একখানি পত্র ভিণ্ডিশকে (E. Windish) লেখেন। ইহাতে তিনি ভারত-নাট্যশালার গ্রীক-প্রভাব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। পত্রখানি Zeitschrift der Dentschen Morgenlandischen Gesellschaft নামক প্রসিদ্ধ জার্মান পত্রে (১৯০৪,

পৃঃ ৪৫৫-৪৫৭) প্রকাশিত হয়। ভিণ্ডিশ নানা যুক্তি সহকারে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে ভারতীয় নাট্যশালার উৎপত্তি গ্রীক আদর্শ হইতে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিতে সারবত্তা আদৌ নাই। ভারতীয়-নাট্যশালার গ্রীক সম্পর্ক প্রমাণিত করিতে হইলে প্রথমে গ্রীকদের নাট্যশালা সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আপাততঃ গ্রীক ও রোমান নাট্যশালা সম্বন্ধে দিগ্দর্শন হিসাবে সামান্য কিছু বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বারান্তরে এ-সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পুরাতন গ্রীস ও রোমের দুইটি সাধারণ স্থান বড় প্রিয় ছিল—একটি মন্দির, অপরটি নাট্যশালা। এই দুইটি স্থানে গ্রীক ও রোমানদের দুই রকম ক্ষুধা মিটিত। প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার দুইটি ভাগ ছিল। একটি Orchestra, অপরটি Theatron (থিয়েটার)। নাট্যশালা তৈরি করিবার জন্য প্রায়ই পাহাড়ের ঢালু জায়গা পছন্দ করা হইত। দর্শকদিগের বসিবার আসন পাহাড় কাটিয়া করা হইত। এই আসনগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিত। আসনগুলি এমনই করিয়া তৈরি যে, একটি আসন-শ্রেণী আর একটির চেয়ে উঁচু। ইহাতে দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইত। আসন-শ্রেণীগুলি কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ চক্রাকারে বাহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক চক্রাংশের পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের ⅔ অংশ। এইগুলির মধ্যে-মধ্যে আবার যাতায়াতের জন্য খানিকটা করিয়া জায়গা ফাঁক রাখা হইত। যাতায়াতের পথগুলির দুইপাশে বসিবার আসনগুলি (bench) পরস্পর সমান্তরাল রেখায় থাকিত। যখন রঙ্গালয়ে ভিড় হইত, দর্শকগণ অগত্যা যাতায়াতের পথগুলি অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতে বাধ্য হইত। সকলের নিচের বা সম্মুখের আসন-শ্রেণী হইতে সকলের উঁচু বা একেবারে পিছনের আসন-শ্রেণীর মাঝে-মাঝে সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকিত। দর্শকদিগের এই বসিবার জায়গার সম্মুখেই একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র থাকিত। ইহারই নাম Orchestra। এই জায়গাটি ঐক্যতানবাদন ও নৃত্য প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রটি তক্তা দিয়া ঢাকা ; ইহার মধ্যস্থলে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর দেবতা Dionysus-এর বেদির (Thymele) স্থান। কখন-কখন এটি আবার সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের নেতা, বংশীবাদক বা উত্তর সাধকের দ্বারা অধিকৃত হইত। Orchestra-র পিছনেই নাট্যমঞ্চ বা Stage। এটি কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। সম্ভবতঃ বাদক-সম্প্রদায় Orchestra হইতে নাট্যমঞ্চে আরোহণ করিত।

নাট্যমঞ্চের পিছনে কয়েকটি দ্বারযুক্ত একটি প্রাচীর থাকিত। ইহাকে তাহারা বলিত Spene (Lat scaena) এবং Orchestra-র মধ্যবর্তী স্থানের নাম ছিল Proskenion (Pros-cenium)। কথাবার্তার সময় এইটি অভিনেতাদিগের দাঁড়াইবার স্থান। দৃশ্যপট বা Scene বলিতে যাহা বুঝায়, তখনকার থিয়েটারে সেরূপ কিছুই ছিল না। তবে যে-স্থান সম্পর্কে অভিনয় চলিতেছে এইটুকু নির্দেশ করিবার জন্য তখনকার Scaenaকে চিত্র-বিচিত্র করা হইত। নাট্যশালার কোন অংশ ছাদ দিয়া আচ্ছাদিত ছিল না। কাজেই অভিনয়ের সময় বৃষ্টি হইলে দর্শকদিগকে বাধ্য হইয়া নাট্যশালার চারিপাশের বারান্দার নিয়ে আশ্রয় লইতে হইত। অভিনয় প্রায় দিনের বেলাই হইত। সুতরাং রৌদ্র-নিবারণের জন্য সময়ে-সময়ে চাঁদোয়ার ব্যবস্থা থাকিত। গ্রীক থিয়েটারের নির্ম্মাণ পদ্ধতির একটি বিশেষ দোষ ছিল। দর্শকদিগের মধ্যে যাহাদের সকলের পিছনে বসিতে হইত; তাহারা সম্মুখের কিছুই দেখিতে পাইত না। তাহাদের নজর নাট্যমঞ্চের পাশের দিকে পড়িত। গ্রীক নাট্যশালাগুলি খুব বড় ছিল। এত বড় করিবার উদ্দেশ্য সহরের সমগ্র অধিবাসীকে একসঙ্গে অভিনয় দেখিবার সুযোগ দেওয়া। বিরাট নাট্যশালায় বহুলোকের স্থান সঙ্কুলান হইত বটে। কিন্তু অতি অল্পলোকই অভিনেতাদের কথা শুনিতে বা তাহাদের মুখের ভাবভঙ্গি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত। অনেককেই এ-সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। তবে তাহাদের নাট্যশালার এই সমস্ত ত্রুটি আমাদের যতটা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় তাহাদের ততটা বোধ হইত না। ইহার কারণ এই যে, আমরা নাট্যকে এখন যেভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহারা তখন সেভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত ছিল না। প্রাচীনকালের অভিনেতৃবর্গ ধাতুনির্ম্মিত একরকম মুখোস পরিত ; এটি প্রকারান্তরে Speaking trumpet-এর কাজ করিত। অত্যন্ত দূরের দর্শকগণ অত্যন্ত ছোট দেখিবে বলিয়া একটু বড় দেখাইবার জন্য তাহারা খুব উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতা পায়ে দিয়া শরীরটাও pad-এর সাহায্যে বৃহৎ করিয়া নাট্যমঞ্চে নামিত।

আধুনিক থিয়েটারের পূর্বাবস্থায় যেমন সকল অভিনেতাই পুরুষ ছিল। গ্রীক থিয়েটারেও সেইরূপ অভিনয় কেবল পুরুষেই করিত। স্ত্রীলোকেরা তখন থিয়েটার দর্শনে বঞ্চিত ছিল ; তবে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইবার বাধা ছিল না। খৃঃ পূর্ব পঞ্চাশ শতকে তাহারা পৃথক স্থানে বসিয়া অভিনয় দেখিত।

অভিনয় প্রাতঃকালেই আরম্ভ হইত। পরপর দুই-তিনটি নাটকের অভিনয় হইত। শেষে একটা প্রহসন হইয়া অভিনয় শেষ হইত। পুরা অভিনয় শেষ হইতে দশ-বার ঘণ্টা লাগিত।

সম্মুখের আসন-শ্রেণীতে কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, পুরোহিত ও রাজদূতেরাই বসিতে পাইত। যাহারা বেশি পয়সা খরচ করিতে পারিত, তাহারাই অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে বসিবার অধিকারী হইত। কিন্তু পেরিক্লিসের সময় হইতে গরিবেরা বিনা খরচে থিয়েটার দেখিতে পাইত। সাধারণ কোষাগার হইতে তাহাদের খরচ যোগান হইত। শেষে নগরবাসী সকলেই সেই সুবিধা ভোগ করিয়াছিল।

প্রায় ৪৯৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্রথম পাথরের থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। ইহার পর হইতে চারিদিকে থিয়েটারের ধূম লাগিয়া গেল। গ্রীস, এসিয়া-মাইনর এবং সিসিলির সকল নাট্যশালাই এথেন্সের নাট্যশালার অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। তবে এইগুলিতে কিছুকিছু পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছিল।

রোমে ২৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঠিক অভিনয় হয় নাই। এই সময় একটি কাঠের রঙ্গমঞ্চও তৈরি হয়। প্রত্যেকবার অভিনয়ের পরে আবার সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। ১৯৪ পূর্ব খৃষ্টাব্দের সেনেটররা নাট্যমঞ্চের পথের উপর বসিতে পাইত। কিন্তু তাহাদের নিরূপিত কোন আসন ছিল না। যাহাদের বসিবার দরকার হইত তাহারা নিজেদের চেয়ার আনিত। কখন কখন সরকারের হুকুমে বসিয়া অভিনয় দেখা বন্ধ হইত। ১৫৪ পূর্ব খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট আসনযুক্ত স্থায়ী থিয়েটার করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সেনেটের আদেশে থিয়েটার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। ১৪৫ পূর্ব খৃষ্টাব্দে গ্রীস-বিজয়ের পর গ্রীকদের অনুকরণে থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। সেগুলিও কাঠের। একবারের বেশি তাহাতে অভিনয় হইত না। পাথরের তৈরি প্রথম রোমান থিয়েটার ৫৪ পূর্ব খৃষ্টাব্দে হয়। Pompey এই থিয়েটার করেন। ১৭,৫০০ বসিবার আসন ইহাতে ছিল।

১৩ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আগস্টস (Augustus) তাঁহার ভাইপো মারসেলাসের (Marcellus) নামে একটি থিয়েটার করেন। এই থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান।...

গ্রীক ও রোমান থিয়েটারের সাদৃশ্যও যেমন ছিল, পার্থক্যও তেমনই ছিল। পার্থক্য ছিল দর্শকদের স্থান লইয়া। গ্রীকদের মতন এটিও সমান্তরাল পথ ও সিঁড়ি দিয়া বিভক্ত ছিল। তবে এই ভাগগুলি সমানভাবে গ্রীকদের মতো

ছিল না। ছিল অর্দ্ধবৃত্তাকারে। আর ইহার ব্যাসের শেষে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের প্রাচীর ছিল। গ্রীকরা অর্দ্ধবৃত্তের অপেক্ষা বড় করিয়া এটিকে তৈরি করিত। রোমানদের থিয়েটারের সর্বোচ্চতলের স্তম্ভগুলির আবরণের উচ্চতা সমান ছিল।

[প্রথম প্রকাশ: প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৬। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।]

অশোকনাথ শাস্ত্রী

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে কোন দৃশ্যকাব্যের অভিনয় আরম্ভ করিবার পূর্বে কুশীলবগণ একত্র মিলিত হইয়া রঙ্গবিঘ্নশান্তির উদ্দেশ্যে একপ্রকার মাঙ্গলিক উৎসবের আয়োজন করিতেন। উহার নাম ছিল 'জর্জরোৎসব'। প্রাচীন ইংলণ্ডের May-day rites বা May-pole dance-এর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। সে-যুগের অভিনয়ের সহিত জর্জরোৎসবের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কল্পনাও করা যাইত না। এই জর্জরোৎসবের ইতিহাসই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা।

* * * *

পুরাকালে একদিন মহর্ষি ভরত তাঁহার নিত্য জপ শেষ করিয়া শতপুত্র ও শিষ্য পরিবৃত হইয়া তপোবনে বসিয়াছিলেন। সেদিন অনধ্যায়—বেদপাঠের পরিশ্রম হইতে ঋষিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব, ইহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আত্রেয় প্রমুখ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ ভরতকে প্রশ্ন করিলেন—'বেদানুমোদিত ও চতুর্বেদের সমকক্ষ নাট্যবেদ নামে যে-গ্রন্থ আপনি কিছুদিন পূর্বে সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহা কিরূপে ও কাহার নিমিত্তই বা উৎপন্ন হইয়াছিল?' ইহা ছাড়া—নাট্যের কয়টি অঙ্গ, কি প্রমাণ ও রঙ্গমঞ্চে উহার প্রয়োগবিধি কীদৃশ—এ-সকল বিষয় সম্বন্ধেও তাঁহারা বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরতও একে-একে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

প্রথমেই নাট্যের উৎপত্তি ও নাট্যবেদরচনার কথা।

সাধারণের ধারণা নাট্যবেদ ব্রহ্মার রচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চতুর্বেদের ন্যায় উহাও অপৌরুষেয় ও অনাদি। ব্রহ্মা উহার প্রবর্তয়িতা মাত্র, রচয়িতা নহেন। স্বায়ম্ভুব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈবস্বত অবধি প্রত্যেক মন্বন্তরেরই (১)

ত্রেতাযুগে নাট্যবেদ পিতামহ (ব্রহ্মা) কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কখনও কোন সত্যযুগে নাট্যবেদের প্রচার হয় নাই।

স্বায়ম্ভুব হইতেছে প্রতি কল্পের আদি মন্বন্তর। উহার প্রথম সত্যযুগ ও সত্য-ত্রেতার সন্ধিকাল অতিক্রান্ত হইবার পর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে—দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, মহোরগ প্রভৃতির দ্বারা সমাক্রান্ত—লোকপালগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—মানবের কর্মভূমি জম্বুদ্বীপে—প্রজাপুঞ্জ গ্রাম্যধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ, ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোক-সমাজে একপাদ পাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রজাগণ পাপ-সঞ্চারের ফলে কাম ও লোভের বশীভূত—ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিমূঢ় হইয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—

'পিতামহ! আমরা চিত্তবিনোদনের উপযোগী এমন একটি হিতকর ক্রীড়ার দ্রব্য চাই, যাহা একাধারে দৃশ্য ও শ্রব্য হইতে পারে। শূদ্র জাতিগুলির পক্ষে বেদাধ্যয়ন বা শ্রবণের কোন বিধি নাই। অতএব, আপনি কৃপাপূর্বক সকল জাতির শ্রবণযোগ্য একটি সার্ববণিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন।'

তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া সদলবলে দেবরাজকে তখনকার মতো বিদায় দিলেন। পরে যোগবলে চতুর্বেদের স্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন সঙ্কল্প করিলেন—'আমি নাট্যাখ্য এমন এক পঞ্চম বেদ সঙ্কলন করিব যাহা ধর্ম-বুদ্ধির অনুকূল, অর্থপ্রদ, হৃদ্য, প্রয়োজনীয়, যশস্য, নানা উপদেশবহুল। ধর্মার্থ কাম-মোক্ষাত্মক চতুর্বর্গের উপায় প্রবর্তক, চতুর্বেদের সংগ্রহ-স্বরূপ (digest) সর্বশাস্ত্রের সারভূত, সর্বপ্রকার শিল্পের আকরস্বরূপ ও ইতিহাস সংযুক্ত হইবে।'

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভগবান লোক পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বেদের অঙ্গসম্ভূত নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিলেন উহার পাঠ্য অংশ। সামবেদ হইতে গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ববেদ হইতে লইলেন রস। এইরূপে সর্ববেদবিৎ পিতামহ কর্তৃক চতুর্বেদ ও আয়ুর্বেদাদি উপবেদগুলির সহিত সম্বন্ধ নাট্যবেদ সৃষ্ট হইল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় নাট্যবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অপূর্ব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা এইরূপ। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ ইহাকে একবারেই রূপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিভিন্ন মতবাদ এ-প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

নাট্যবেদ সঙ্কলনের পর ব্রহ্মা সুরেশ্বর ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ,

দেবরাজ! ইতিহাস (দশরূপক) ত আমি সৃষ্টি করিলাম। এখন তুমি দেবগণের মধ্যে উহার প্রচার কর। যাঁহারা উক্ত বিদ্যা গ্রহণে (গুরু-মুখ হইতে শিক্ষা করিতে) ও ধারণে সমর্থ, উহাপোহ বিচার করিতে অপরাঙ্মুখ, লোক-সমাজে ভীত (nervous) নহেন—এইরূপে কুশল, বিদগ্ধ, প্রগল্‌ভ ও জিতশ্রম শিক্ষার্থিগণের মধ্যে এই নাট্যবেদ বিদ্যা তুমি বিতরণ কর।'

ইহার উত্তরে ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে বলিলেন—'ভগবন দেবগণ চিরদিন সুখভোগে অভ্যস্ত। নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান (উহাপোহবিচার), প্রয়োগ (রঙ্গমঞ্চে অভিনয়) প্রভৃতি পরিশ্রমসাপেক্ষ নাট্যকর্মে তাঁহারা কখনও সমর্থ হইবেন না। বেদের রহস্যবিৎ, কষ্টসহ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রত-নিয়মপরায়ণ ঋষিগণই নাট্যবেদ শিক্ষা ও প্রয়োগ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।'

ইন্দ্রের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে কমলাসন ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তুমি শতপুত্র সহযোগে নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ কর।'

অনন্তর ভরত ব্রহ্মার নিকট যথাবিধি নাট্যবেদ অধ্যয়নপূর্বক নিজের শত-পুত্রকে যথারীতি নাট্যশিক্ষা প্রদান করিলেন। অভিনয়ে যিনি যে-ভূমিকা গ্রহণের যোগ্য, তাঁহাকে সেই ভূমিকা প্রদান করা হইল। সর্বনাট্যের মাতৃকা-স্বরূপিনী চারিটি বৃত্তির (style in composition) মধ্য হইতে নাট্য প্রয়োগের উপযোগী দেখিয়া ভরত প্রথমে তিনটিমাত্র বৃত্তি বাছিয়া লইয়াছিলেন। ভারতী, সাত্ত্বতী ও আরভটী—এই তিনটি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভরত নাট্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা উহাদিগের সহিত কৈশিকী বৃত্তি ও (২) যোগ করিতে আদেশ দিলেন। উত্তরে ভরত বলিলেন—'পিতামহ! কৈশিকী প্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ আমার অধিকারে নাই। সে-দ্রব্য আপনাকেই সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এই কৈশিকী বৃত্তি নৃত্ত (৩) ও অঙ্গহার সম্পন্ন, রসভাবক্রিয়াত্মক, শ্লক্ষ্ণনেপথ্যযুক্ত ও শৃঙ্গাররস সম্ভূত—ইহা আমি ভগবান শঙ্করের নৃত্যে লক্ষ্য করিয়াছি। একমাত্র 'পরিপূর্ণানন্দ নির্ভরীভূত দেহ সন্দরাকার' অর্দ্ধাঙ্গীকৃত দাম্পত্য অর্দ্ধনারীশ্বরদের ব্যতীত অপর কোন পুরুষের পক্ষে কৈশিকী প্রয়োগ অসম্ভব। শুধু অভিনেতার দ্বারা এ-কার্য চলিবে না অভিনেত্রীরও প্রয়োজন।

এই কথা শুনিয়া পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যালঙ্কারচতুরা (৪) অপ্সরাগণের সৃষ্টি করিলেন। এই অপ্সরাগণ ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি। ইহারাই ভারতের আদি অভিনেত্রী। আর ভরতের শতপুত্র হইলেন প্রথম অভিনেতা।

তাহার পর সশিষ্য স্বাতি নামক ঋষি ভাণ্ডের অধিকারে ও নারদাদি গন্ধর্বগণ গানযোগে (৫) নিযুক্ত হইলেন। ইহাই হইল ভারতের প্রথম নাট্য সম্প্রদায়।

এইরূপে নিজের দল গঠন করিয়া ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'পিতামহ! নাট্যশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে! এখন কি করা যায় আদেশ করুন।'

পিতামহ উত্তর দিলেন—'ভরত! নাট্যপ্রয়োগের উপযুক্ত অবসর ত সম্মুখে উপস্থিত। শ্রীমান মহেন্দ্রের ধ্বজমহোৎসব প্রবৃত্তপ্রায়। ইহাতেই নাট্যবেদের প্রয়োগ কর।'

দেবগণের সহিত সঙ্ঘর্ষে অসুর ও দানবগণ নিহত হওয়ায় মহেন্দ্রের বিজয়-স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত প্রহৃষ্ট অমরগণ একত্রে মিলিত হইয়া উক্ত ইন্দ্রধ্বজমহোৎসবের আয়োজন করিতে ছিলেন।

শক্র ধ্বজমহোৎসবে অভিনয়ের প্রারম্ভে ভরত প্রথমে নান্দী রচনা করিলেন। ঐ নান্দী আশীর্বচন-সংযুক্ত, বিচিত্র, বেদসম্মত ও অষ্টাঙ্গ পদসংযুক্ত হইয়াছিল। (৬) তাহার পর যেরূপে দৈত্যগণ দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার অনুকরণে ঠিক তদনুরূপ ঘটনার সন্নিবেশ নাট্যে করা হইল।

ব্রহ্মাদি দেবগণ অভিনয়ের আয়োজন দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভরতের পুত্রগণকে সর্বপ্রকার উপকরণ প্রদান করিলেন। প্রথমেই প্রীত হইয়া ইন্দ্র দিলেন তাঁহার শুভ বিজয়-ধ্বজ। ব্রহ্মা দিলেন বিদূষকের ব্যবহারোপযোগী কুটিলক অর্থাৎ বক্র-দণ্ড। বরুণ দিলেন পারিপার্শ্বিকের উপযোগী ভৃঙ্গার। সূর্য দিলেন জলদপ্রতিম ছত্র বা বিতান (চাঁদোয়া)। শিব দিলেন দৈবী ও মানুষী সিদ্ধি। বায়ু দিলেন ব্যজন, বিষ্ণু—সিংহাসন, কুবের—মুকুট ইত্যাদি।

অতঃপর দৈত্য-দানব নাশের অভিনয় আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া যে সকল দৈত্য অভিনয় দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইয়াছিল তাহারা ক্ষুভিত-চিত্তে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বিঘ্নগণের সহিত পরামর্শ আঁটিল—'এরূপ ধরনের অভিনয় আমরা পছন্দ করি না। অতএব, আইস—ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া যাক!'

তখন অসুর ও বিঘ্নগণ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া রঙ্গমঞ্চগত নর্তকগণের বাক্য, শারীরিক চেষ্টা ও স্মৃতি স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। সূত্রধারকে এইরূপে সহসা বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া দেবরাজ—'একি! কোথা হইতে সহসা অভিনয়ের এ-

প্রকার বৈষম্য উপস্থিত হইল?'—বলিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। যোগবলে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, বিঘ্নগণ অদৃশ্যভাবে রঙ্গমণ্ডপটি একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর সূত্রধার ও তাঁহার সহকারী সকলেই তাহাদের প্রভাবে নষ্টসংজ্ঞ ও জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ইন্দ্র সহসা উঠিয়া তাঁহার বিজয়-ধ্বজ তুলিয়া লইলেন। বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে তাঁহার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। ধ্বজদণ্ড হস্তে তিনি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দেহ বিচিত্ররত্নপ্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে রক্তাক্ত নয়ন আঘূর্ণিত। রঙ্গপীঠগত বিঘ্ন ও অসুরগণকে সেই ধ্বজ প্রহারে তিনি জর্জর করিয়া ফেলিলেন। বিঘ্ন ও অসুরগণের মধ্যে কেহ নিহত, কেহ বা পলায়নপর হইলে দেবগণ হৃষ্টমনে বলিতে লাগিলেন—'দেবরাজ! অদ্ভুত তোমার এই দিব্য প্রহরণ। যাহার সাহায্যে তুমি দানবগণের সর্বাঙ্গ জর্জর করিয়া দিয়াছ। যেহেতু উহার প্রহারে বিঘ্ন ও অসুরগণ জর্জরীকৃত হইয়াছে, অতএব অদ্য হইতে তোমার এই দিব্য-ধ্বজের নাম হউক 'জর্জর'। যে-সকল দুষ্ট অতঃপর নাট্যহিংসার চেষ্টা করিবে, তাহারা এই জর্জর দেখিলে আর পলাইবার পথ পাইবে না।' ইন্দ্র উত্তর দিলেন—'তথাস্তু। আজ হইতে রঙ্গালয়ের রক্ষক হইবে এই জর্জর।'

ইহার পর ধ্বজমহোৎসব আবার জমিয়া উঠিল। অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু হতাবশিষ্ট বিঘ্নগণ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিল না। তাহারা অদৃশ্য থাকিয়া নর্তকদিগের ভয় জন্মাইতে লাগিল। তখন ভরত পিতামহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বিঘ্নগণ নাট্য-বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আপনি স্বয়ং ইহার রক্ষা বিধান করুন।' তখন ভগবান ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন দুর্ভেদ্য নাট্যগৃহ নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। অচিরে প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হইল। পিতামহ দেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা এক-একজন নাট্যগৃহের এক-এক অংশ রক্ষার ভার লও।' সকলেই সম্মত হইলেন। মণ্ডপ রক্ষার ভার পড়িল চন্দ্রমার উপর। লোকপালগণ দিক্-রক্ষা ও মারুতগণ বিদিক্-রক্ষার ভার লইলেন। নেপথ্যভূমি রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন মিত্র, অম্বর রক্ষা করিতে লাগিলেন বরুণ। রঙ্গ-বেদিকার রক্ষক হইলেন অগ্নি ও বাদ্যভাণ্ড রক্ষায় অবশিষ্ট সকল দেবতাই তৎপর রহিলেন। এইরূপে এক-একজন দেবতা নাট্যগৃহের এক-এক অংশ রক্ষার্থ স্বেচ্ছাসেবক সাজিলেন।

তখন দৈত্যনাশক বজ্র জর্জরের শিরোভাগে নিক্ষিপ্ত হইল। আর উহার এক-একটি পর্বে অভিতরেজাঃ দেবগণ অধিষ্ঠান করিলেন। সর্বোচ্চে শিরঃপর্বে বসিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং। তাহার নিম্নপর্বে শঙ্কর, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে স্কন্দ ও পঞ্চম বা সর্বনিম্নপর্বে বসিলেন—শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন মহানাগ। নায়কের রক্ষার ভার লইলেন ইন্দ্র, ও নায়িকার রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন সরস্বতী।

তারপর দেবগণের অনুরোধে বিঘ্নগণের সহিত বিবাদ আপোষে মিটাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মা তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অভিনয় পণ্ড করিবার জন্য তোমাদের এত প্রয়াস কেন?'

ব্রহ্মার বাক্যে একটু নরম হইয়া বিরূপাক্ষ দৈত্য ও বিঘ্নগণের মুখপাত্র হইয়া বলিল—'দেবগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আপনি যে-নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ত দেখিতেছি লোকচক্ষুর সমক্ষে আমাদিগের হেয় প্রতিপাদন করা। দেবতাই বলুন, আর দৈত্যই বলুন—সবই ত আপনার সৃষ্টি। আপনার নিকট আমরা উভয়পক্ষই সমান। তবে দেবতাদিগের প্রতি এ-পক্ষপাত কেন করিলেন?'

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন—'বৎস দৈত্যগণ! তোমরা ক্রোধ ও বিষাদ পরিত্যাগ কর। কেবল তোমাদেরই পরিভব দেখাইবার নিমিত্ত নাট্যবেদ সৃষ্টি হয় নাই। আর দেবতাদিগের নিছক স্তুতিবাদের নিমিত্ত যে ইহার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাও মনে ভাবিও না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ত্রৈলোক্যেরই ইহা ভাবানু-কীর্তন স্বরূপ। ইহার মধ্যে কোথাও ধর্মানুষ্ঠান, কোথাও বা ক্রীড়া, কোথাও অর্থলাভ, কোথাও বা শমপ্রাপ্তি, কোথাও হাস্য, কোথাও বা যুদ্ধ, কোথাও কাম। কোথাও বা বধ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধার্মিকগণ ইহাতে ধর্মের সন্ধান পাইবেন। কাম্য বিলাসীর ইহা কামপরিপূরক। দুর্বিনীতের ইহা নিগ্রহ স্বরূপ। বিনীতগণের পক্ষে ইহা দম ক্রিয়া। শূর মানিগণের ইহা উৎসাহজনক। মূঢ়গণের পক্ষে ইহা শিক্ষার উপায়। পণ্ডিতগণের নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশের উপযুক্ত উপকরণ। ঐশ্বর্যশালীর নিকট ইহা বিলাসের উপাদান। শোকগ্রস্তের ইহা শান্তি দাতা। অর্থলিপ্সুর পক্ষে ইহা উপার্জনের একটি প্রধান উপায়। উদ্বিগ্ন চিত্তের ইহা স্থৈর্যসম্পাদক। সপ্তদ্বীপের মধ্যে যেখানে যাহা ঘটিয়াছে বা-ঘটিতে পারে—দেব, দানব, রাজা, ঋষি, মনুষ্য—যাহার যেরূপ স্বভাব—তাহার অবিকল অনুকরণ এই নাট্য।

এক কথায়, ইহাকে 'জীবনের জীবন্ত অনুকরণ' বলিতে পারা যায়। অতএব এই ব্যাপারে তোমাদের ক্রোধের কোন কারণ থাকা সঙ্গত মনে করি না। কারণ, ইহাতে সত্য ঘটনারই হুবহু অনুকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেল।'

এইরূপে সামপ্রয়োগে বিঘ্নগণকে শান্ত করিয়া ব্রহ্মা দেবতাগণকে আদেশ দিলেন -'আজ নাট্যমণ্ডপে তোমরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন কর। মন্ত্রপাঠ করিয়া বচা-বলা-ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি দ্বারা হোম কর। মোদকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য ও ক্ষীর-ইক্ষু-দ্রাক্ষারস পায়স-কৃসর (খিচুড়ি) প্রভৃতি সরস দ্রব্যের দ্বারা বলি প্রদান কর। তোমাদের দেখিয়া মর্ত্যের অধিবাসিগণ জর্জরের পূজাবিধি শিক্ষা করিতে পারিবে। রঙ্গপূজা না করিয়া কদাপি অভিনয় করিতে নাই। করিলে অভিনয় নিষ্ফল হয় ও অভিনয়কারিগণ তির্যগযোনি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে রঙ্গপূজাদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।' ইহা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

পাদটীকা

১. মনু মোট ১৪ জন—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিব, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্ম-সাবর্ণি, (১১) ধর্ম-সাবর্ণি, (১২) রুদ্র-সাবর্ণি, (১৩) দেব-সাবর্ণি ও (১৪) ইন্দ্র-সাবর্ণি। এক-এক মনুর অধিকার কালের নাম এক মন্বন্তর—কিঞ্চিদধিক ৭১ দিব্যযুগ। ১০০০ দিব্যযুগ=১৪ মন্বন্তর=১ কল্প=ব্রহ্মার ১ দিন=৪৩২ কোটি বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ পরিমাণ=৪৩২০০০০ বৎসর। সত্যযুগ=১৭২৮০০০ বৎসর। ত্রেতা=১২৯৬০০০ বৎসর। দ্বাপর=৮৬৪০০০ বৎসর। কলি=৪৩২০০০ বৎসর। বর্তমান কলিযুগ শ্বেতবরাহ কল্পের অন্তর্গত সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগ। প্রতি কল্পান্তে একবার করিয়া মহাপ্রলয় হইয়া থাকে।

২. ভারতী—সংস্কৃত বাক্যযুক্ত। পুরুষপ্রযোজ্য বাক-প্রধান ব্যাপার। ভরতপুত্রগণ ইহার প্রথম প্রয়োগ করেন বলিয়া ইহার নাম ভারতী। অভিনবগুপ্তের মতে ইহা বাগবৃত্তি। ইহা ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। করুণ ও অদ্ভুতরসে ব্যবহার্য। ইহা সাধারণত স্ত্রীবর্জিত। সাত্বতী—সত্ত্ব, শৌর্য, ত্যাগ, দয়া, ঋজুতা প্রভৃতি গুণ বর্ণনার উপযোগী। উৎকট হর্ষ ইহাতে

আছে—কিন্তু শোক নাই। অভিনবগুপ্তের মতে মনোব্যাপার রূপা সাত্ত্বিকীবৃত্তি সাত্বতী। সত্ত্ব—মন। যজুর্বেদ হইতে ইহা গৃহীত। বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস বর্ণনার উপযোগী—শোক বা শৃঙ্গার বর্ণনার অনুপযোগী। আরভটী—মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা। বধ, বন্ধন, মিথ্যা, দণ্ড প্রভৃতি দেখাইতে ইহার উপযোগ। অভিনবগুপ্তের মতে ইহা কায়বৃত্তি। অর—সোৎসাহ, অনলস। ভট—চর, ভৃত্ত। অনলস ভৃত্তের যে-সকল গুণ—বহুভাষণ, মিথ্যা বাক্য, কাপট্য—সে-সব ইহাতে আছে। ইহা অথর্ববেদ হইতে গৃহীত। ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র রসে আরভটি বৃত্তি ব্যবহার্য। কৈশিকী—ঢিলা পোশাক পরিয়া ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা স্ত্রীসংযুক্ত, নৃত্য-গীতবহুল ও শৃঙ্গার প্রতিপাদক। অভিনবগুপ্তের মতে ইহা সৌন্দর্যোপযোগী ব্যাপার। কেশ যেমন কোন প্রয়োজন সাধন না করিলেও শরীর-শোভাকর হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। ইহা সামবেদ হইতে গৃহীত। শৃঙ্গার ও হাস্যরসে ইহা ব্যবহার্য।—নাট্যশাস্ত্র—২২ অঃ।

৩. নৃত্ত—অঙ্গোপাঙ্গগণের সবিলাস বিক্ষেপ। অঙ্গহার—অঙ্গগণের অত্রুটিতভাবে সমুচিত স্থান প্রাপন। নৃত্য—ভাবাভিব্যক্তি সহ অঙ্গবিক্ষেপ, রসভাবক্রিয়াত্মক—রসসমূহের যে-ভাব, ভাবনা। অর্থাৎ কবি, নট—সামাজিকগণের হৃদয়ে ব্যাপ্তি। তাহার যে-ক্রিয়া অর্থাৎ ইতি—কর্ত্তব্যতা, তাহাই আত্মা (স্বভাব) যাহার—সেই বৃত্তি কৈশিক। প্রস্কন্নেপথ্য—ঢিলা পোষাক—Deshalible।

৪. নাট্যালঙ্কার—নাট্যের বৈচিত্র্যহেতু প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ কৈশিকী বৃত্তি। অর্থাৎ সপ্তদশ নাট্যালঙ্কার—স্ত্রীলোকের স্বভাবজ অলঙ্কার দশটি—লীলা-বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিবৃত; অনত্রজ অলঙ্কার সাতটি—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুরী, ধৈর্য, প্রাগলভ্য, ঔদার্য।

৫. ভাণ্ড—বাদ্য বিশেষ। এ-স্থলে ঢক্কা জাতীয় বাদ্য—অবনদ্ধ বা পৌষ্কর বাদ্য। পণব, মৃদঙ্গ, ঝল্লকী, প্রভৃতি পুষ্কর জাতীয় বাদ্য ইহার অন্তর্ভুর্ত। গানাষাণ—গীতের অধিকার নহে। গান—তত (বা তন্ত্রীবাদ্য অর্থাৎ তাঁত বা তাঁতের যন্ত্র) ও সুষির (হাওয়ার বাজনা)। ইহা ছাড়া ধাতুময় বাদ্যও (ঘন) ইহাতে ছিল। বাদ্য মোট চারি প্রকার—তত, সুষির, ঘন ও অবনদ্ধ। এক্ষেত্রে ইহাদিগকে (কুতপ) বলিত।

৬. অষ্টাঙ্গপদসংযুক্ত—আটটি পদ যাহার অঙ্গভূত। 'পদ' বলিতে অভিনবগুপ্তের মতে সুবন্ত—তিঙন্ত, পদ অথবা অবান্তর বাক্য উভয়ই বুঝায়। নান্দী নানাবিধ (নাঃ শাঃ ৫ম অঃ)।

[প্রথম প্রকাশঃ উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০।]

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-উপাখ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায়, পূর্ব-পূর্ব প্রবন্ধে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (১) কিন্তু আলঙ্কারিক শারদাতনয় (খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) তাঁহার 'ভাব প্রকাশন' নামক গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ নূতন উপাখ্যান পৃথক-পৃথক স্থান পৃথকভাবে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (২) পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে উপাখ্যান দুইটি বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হইল।

[১]

কল্পাবসানে একদিন মহেশ্বর লোকসমূহ দগ্ধ করিয়া স্ব-মহিমায় অবস্থিত ছিলেন। এই অবস্থায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দেবাদিদেব স্বচ্ছন্দ-বশতঃ আনন্দমন্থর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যাবসরে তাঁহার মন হইতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। তৎকালে বামদিকে বিভুর মায়াময়ী বৈষ্ণবী শক্তি সর্বমঙ্গলা অম্বিকার রূপ ধারণপূর্বক অবস্থিত ছিলেন।

অতঃপর প্রাকৃত সৃষ্টি প্রবর্তিত হইল। দেব-দেবের নিয়োগে ব্রহ্মা আবার লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির অন্তে তিনি পরমেশ্বরের পুরাবৃত্ত স্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন :—'এই দিব্য ঐশ-চরিত্র আমি কিরূপে আরম্ভ করিব ?'—এইরূপ চিন্তায় পিতামহ যখন অত্যন্ত ব্যাকুল, তখন দেবাদিদেবের প্রিয়তম অনুচর নন্দিকেশ্বর তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন—'পিতামহ! আপনি আমার নিকট নাট্যবেদ অধ্যয়ন করুন।'

নাট্যবেদের অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে তিনি চতুর্মুখকে প্রয়োগ কৌশলের শিক্ষা দান করিয়া বলিলেন—'পিতামহ! আপনার মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি। নাট্যবেদোক্ত যে-সকল রূপকের উপদেশ আমি দিলাম, তদনুসারে যথাযথ

লক্ষণান্বিত একখানি রূপক আপনি রচনা করুন; অনন্তর (নট)-গণ-কর্তৃক যথাবিধি উহার প্রয়োগ করান। ভাবাভিনয়-পটু ভরতগণ নাট্যপ্রয়োগ করিলে প্রাক্তন কল্পের কর্মাবলী আপনার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে পারিবে।' এই বলিয়া ভগবান, নন্দী অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে পিতামহ ব্রহ্মাও নন্দীর বাক্যে পরম প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া 'ত্রিপুরদাহ' নামক রূপক রচনা করিলেন। (৩) দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা ভরতগণকে এই রূপকখানি যথাবিধি শিক্ষা দিয়া ইহার প্রয়োগ করিতে আদেশ দিলেন। একদিন ব্রহ্ম সংসদে ভাবাভিনয়কোবিদ ভরতগণ যখন ত্রিপুরদাহ রূপকের অভিনয় করিতেছিলেন, তখন তাহা দেখিতে-দেখিতে পিতামহের চারিটি মুখ হইতে যথাক্রমে চারি বৃত্তি ও চারিরসের উদ্ভব হইল।

শিব-শিবার মিলন-দৃশ্যের অভিনয়কালে পিতামহের পূর্বদিকের মুখ হইতে কৈশিকী বৃত্তি সম্ভূত শৃঙ্গার রস নিঃসৃত হইল। আবার ভরতগণ যখন ত্রিপুর-মর্দনের অভিনয় করিতেছিল, তখন দক্ষিণ বদন হইতে সাত্ত্বতীবৃত্তিজাত বীররস আবির্ভূত হইল। যখন ভরতগণ কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের অভিনয় নিপুণভাবে হইতেছিল, তখন পশ্চিমবক্ত্র হইতে আরভটীবৃত্তিসমুদ্ভুত রৌদ্ররসের আবির্ভাব ঘটিল। আর নটগণ কল্পান্ত-কালীন শম্ভুর সংহার কর্ম দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলে উত্তরআনন হইতে ভারতীবৃত্তি সঞ্জাত বীভৎস রসের অভিব্যক্তি হইল।

কৈশিকী, সাত্ত্বকী, আরভটী ও ভারতী—এই চারিটি বৃত্তি সর্ববিধ মাতৃকা স্বরূপিনী (৪)। আর শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস—এই চারিটি মূল রস। এই চারিটি হইতে অপর চারিটি রসের নিষ্পত্তির কথা শারদাতনয় বলিয়াছেন।

জটাজিনধারী, ভোগিভূষণ, অগ্নিলোচন, ভস্মাঙ্গরাগযুক্ত বিভু যখন দেবীর প্রণয়প্রার্থী হইলেন, তখন দেবী ও তাঁহার সখীগণের মধ্যে তুমুল কলহাস্য উদ্ভূত হইল। এইজন্য বলা হয়, শৃঙ্গার হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। পূর্ব্বকালে লৌহ, রজত ও কাঞ্চনময় তিনটি পুরী যখন একত্র মিলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অমিতাপাঙ্গী অম্বিকাকে কটাক্ষে অবলোকন করিতে-করিতে একাকী স্মরহর একটি মাত্র শরক্ষেপে কোটী-কোটী অসুর পরিবৃত সেই ত্রিপুর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইরূপ অনন্য সাধারণ বীরকর্মদর্শনে সমস্ত প্রাণী অদ্ভুত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিল। এই হেতু বলা হয়, বীর হইতে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি। আবার বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দেবগণকে নানাভাবে দণ্ড

দান করিলে পর ছিন্ননাস ছিন্নকর্ণ দেবগণ রোদন করিতে থাকেন। তদ্দর্শনে দেবীর সখীবৃন্দের মনে কারুণ্যের উদ্রেক হয়। এই নিমিত্ত রৌদ্র হইতে করুণ রসের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে। দক্ষ আদিদেবগণের অস্থিখণ্ড মাল্যরূপে ধারণপূর্বক শ্মশানে তাহাদের ভস্ম মাখিয়া ভৈরবমূর্তিতে দেবদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া ভয়-বিমূঢ় প্রমথ ভূতপ্রেতগণ তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিল। অতএব, বীভৎস হইতে ভয়ানকের উৎপত্তি বলিয়া ধরা হয়।

শারদাতনয় বলেন, নারদ রসোৎপত্তির এইরূপ প্রকার ও ক্রম ভরতকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাই হইল শারদাতনয়োক্ত নাট্যবৃত্তি ও রসোৎপত্তির প্রথম বিবরণ। দ্বিতীয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[২]

পুরাকালে মহীপতি মনু সপ্তদ্বীপা ধরিত্রী শাসন করিতে-করিতে দুর্বহ, রাজ্যভারে শ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়েন। এই ভূমিভার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া কিরূপে বিশ্রামসুখ প্রাপ্ত হইব—এই চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি পিতা সবিতৃদেবের শরণাপন্ন হইলেন। পুত্রবৎসল দেবভাস্কর পুত্রের স্মরণে ব্যথিত হইয়া মর্তে নামিয়া আসিলেন। মহারাজ মনুও তাঁহাকে ভূভার ক্লেশের কথা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া সূর্যদেব ভারখিন্ন মনুর নিকট নিম্নোক্ত বিশ্রামোপায়ের উল্লেখ করেন—

পূর্বে দুগ্ধাব্ধিনাথ নারায়ণের নাভিকমলসম্ভব ব্রহ্মা চরাচরসমগ্র ভুবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টির আয়াসে পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বিশ্রামসুখলাভের আশায় শ্রীপতির শরণ গ্রহণ করিলেন। আত্মজ পদ্মযোনিকে শ্রান্ত দেখিয়া দেবদেব নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'তাইত! কিরূপ বিনোদনেই বা ইহার বিশ্রাম সম্ভব হইতে পারে!' কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্বক্ষেত্রভাবী বিধিকে আদেশ করিলেন—'ব্রহ্মণ! পুরারাতি অম্বিকাপতি ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন কর। তিনি তোমাকে বিশ্রান্তি সুখোলাভের উপদেশ দিবেন।' এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা দেবদেব উমাপতির নিকটে গমনপূর্বক বহুস্তবস্তুতি করিয়া নিজের খেদ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শম্ভু তাঁহার নির্বেদের কথা অবগত হইয়া নন্দিকেশ্বরকে বলিলেন—'তুমি ত আমার নিকট হইতে আদ্যোপান্ত 'নাট্যবেদ' অধ্যয়ন করিয়াছ। এখন সপ্রয়োগ এই নাট্যবেদ সবিস্তারে ব্রহ্মাকে অধ্যাপনা কর।' নন্দীও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রহ্মাকে নিঃশেষে

নাট্যবেদশিক্ষা প্রদান পূর্বক উহার প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, এই নাট্যপ্রয়োগ দর্শনেই তিনি জগৎ সৃষ্টির আয়াস দূর করিয়া বিশ্রান্তি সুখলাভে সমর্থ হইলেন।

নন্দিকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অনন্তর দেবী ভারতীসহ একান্তে সমাসীন পিতামহ নাট্যবেদ প্রয়োগের উপযুক্ত পাত্রকে মনে-মনে স্মরণ করিলেন। স্মৃতমাত্রে পঞ্চশিষ্যসহ কোন এক মুনি ভারতীসনাথ পদ্মযোনির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পিতামহ সশিষ্য এই মুনিকে আদেশ দিলেন—'নাট্যবেদ ভরণ কর' ('নাট্যবেদং ভরত')। তাঁহারাও সরহস্য সপ্রয়োগ সমগ্র নাট্যবেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন। পরে দেবগণের পুরাবৃত্ত প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করিয়া নাট্যবেদোক্ত নানাবিধ রস-ভাবাভিনয় প্রয়োগে পদ্মযোনিকে সবিশেষ প্রীতি প্রদান করেন। তুষ্ট হইয়া কমলাসন তাঁহাদিগকে অভীষ্টবর প্রদানপূর্বক বলেন, 'যেহেতু আমি বলিয়াছি তোমরা এই নাট্যবেদের ভরণ কর, অতএব অদ্য হইতে জগত্রয়ে তোমরা 'ভরত' নামে বিখ্যাত হইবে, আর নাট্যবেদও তোমাদের নামেই পরিচিত হইবে।' এইরূপ আদেশ দিবার পর হইতে ব্রহ্মার ইঙ্গিতে পরিচালিত সেই ভরতগণ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশজনিত শ্রম বিনোদনে ব্যাপৃত আছেন।

এই উপাখ্যান বর্ণনা করিবার পর সূর্যদেব মনুকে বলিলেন—'হে মনু! তুমিও সেই অচ্যুত-স্বরূপ ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে বসুধা-পালনজনিত ক্লেশের কথা নিবেদন কর। তাঁহার কৃপায় তৎপ্রণীত নাট্যপ্রয়োগ ভূতলে প্রচারিত হইলে ভূভার শ্রান্ত তুমি চিত্তবিনোদ লাভ করিতে পারিবে।' এইরূপ উপদেশ দিয়া দিনকর স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে মহারাজ মনু ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া পিতামহকে প্রণিপাতপূর্বক করুণভাবে আপনার ভূভার শ্রান্তির কথা নিবেদন করিলেন। চতুর্মুখও মনুর ভূমিভার ক্লান্তির বিষয় অবগত হইয়া ভরতগণকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন—'হে বিপ্রগণ! মনুর সহিত ত্রিদিব হইতে তোমরা মর্তে গমন কর। ভারতবর্ষ আশ্রয় করিয়া মনুর সহিতই বাস করিতে থাক।'

পিতামহের এই আদেশ ভরতগণ মানবেন্দ্র মনুর (৫) সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন। পূর্ব-পূর্ব কল্পান্তরে বর্তমান রাজর্ষিগণের চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাট্যপ্রবন্ধগুলির রসভাবপূর্ণ অভিনয় ও নাট্যবেদোপদিষ্ট সঙ্গীতমার্গের বিচিত্র প্রয়োগে তাঁহারা মনুর ভূভারহরণ শ্রান্তি সম্যগ্‌রূপে অপনোদন করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। তারপর কতিপয় দ্বিজ নটশিষ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দেশে দেশে নরেন্দ্রগণের চিত্তবিনোদন করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। এই নাট্যাভিনয়ে প্রযুক্ত দেশরীতি পরিষ্কৃত সঙ্গীত প্রয়োগ-বৈচিত্র্যবলে (দেশী) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত নাট্যবেদ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া ভরতগণ কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একখানির শ্লোক সংখ্যা ছিল দ্বাদশ সহস্র ও অপর একখানি ষট্ সহস্র। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানিই ভরতগণের নামানুসারে বিখ্যাত হইয়া 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র' নামধারণ করিয়াছে। আর মহারাজ মনুই ভারতবর্ষে এই ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক।

ইহা ত হইল শারদাতনয়ের বিবরণ। এই প্রসঙ্গে ধরাধামে নাট্যপ্রচারের যে উপাখ্যান নাট্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে (৬), তাহারও উল্লেখ নিম্নে করা গেল।

সমগ্র নাট্যশাস্ত্র শ্রবণের পর আত্রেয়, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, মনু, আয়ু, বিশ্বামিত্র, সংবর্ত্ত, বৃহস্পতি, বৎস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, বাল্মীকি, কাম, মেধাতিথি, নারদ, পর্ব্বত, ধৌম্য, শতানন্দ, জামদগ্ন্য, পরশুরাম, বামন প্রভৃতি মুনিগণ প্রীতচিত্তে সর্ব্বজ্ঞ ভরতকে প্রশ্ন করেন—"হে বিভো! স্বর্গ হইতে নাট্য মর্ত্তভূমে কিরূপে সঞ্চারিত হইল? আর আপনার বংশই বা কি হেতু নটসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল?"

উত্তরে ভরত বলিলেন—পুরাকালে আমার শতপুত্র নাট্যবেদজ্ঞানে সদান্বিত হওয়ায় সকল লোকের প্রহসন (satire, caricature) করিয়া বেড়াইতেন। কোন এক সময়ে তাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ঋষিগণের চরিত্রকে উপহাস করতঃ একখানি অতি অশ্লীল ও কুৎসিত দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ প্রকাশ্য সভায় করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—আমাদিগকে এইভাবে বিড়ম্বিত করা অত্যন্ত অন্যায়। যে জ্ঞানমদে উন্মত্ত হইয়া তোমরা দুর্বিনীত আচরণ করিতেছ—আমাদিগের পরিভাবেও পশ্চাৎপদ হও নাই—তোমাদের সেই কুজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে তোমাদিগের ঋষিত্ব, ব্রহ্মণত্ব, ব্রহ্মচর্য্য—সকলই লোপ পাইবে—শূদ্রাচার তোমাদিগকে আশ্রয় করিবে। তোমাদিগের বংশও শূদ্র বংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর তোমাদিগের বংশজাত স্ত্রী, বালক, কুমার, যুবা প্রভৃতি সকলেই নটনর্ত্তকবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

আমার পুত্রদিগের এই শাপবৃত্তান্ত শ্রবণে বিমনা দেবগণ মিলিতভাবে কুপিত ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। ঈষৎ সন্তুষ্ট হইয়া ঋষিগণ বলিলেন—"নাট্যশাস্ত্র অবশ্য বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা ছাড়া অভিশাপ বাক্যের অবশিষ্ট অংশ মিথ্যা হইবে না।

তখন দেবগণ বিষণ্ণ চিত্তে আমার নিকট আসিয়া অনুযোগ পূর্ব্বক বলিলেন —"দেখুন, নাট্যদোষে আপনার শতপুত্র শূদ্রাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। লজ্জায় তাঁহারা আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প, আমি তখন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলি— "তোমরা দুঃখ করিও না। ইহা নিশ্চয় পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফল। এ অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? অতএব আত্মনাশের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। এই নাট্যবেদ পিতামহ ব্রহ্মা দ্বারা প্রকীর্ত্তিত। অতি পবিত্র, বেদাঙ্গো-পাঙ্গোসম্ভূত এই নাট্যবেদ অতি কষ্টে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ইহা যাহাতে লুপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। তোমাদিগের নাট্যজ্ঞান শাপ বশতঃ নষ্ট হইবেই। তাই অধীত বিদ্যা তোমাদিগের শিষ্য মণ্ডলীকে দান কর। তাঁহারাই এ বিদ্যার প্রচার করিবেন। বিদ্যাদানের পর তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হও।"

কিছুদিন পর নহুষ নামক চন্দ্র বংশীয় রাজা নীতি, বুদ্ধি ও পরাক্রমে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হন। দৈবী ঋদ্ধি প্রাপ্তির পর গীত ও নাট্যপ্রয়োগ দর্শনে উন্মনা হইয়া তিনি চিন্তা করেন—'মর্ত্তভূমিতে নাট্যপ্রয়োগ কি উপায়ে করা যাইতে পারে? চিন্তাদ্বারা উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি দেবগণকে নিবেদন করেন—"আপনারা মর্ত্তে আমার গৃহে অপ্সরাগণের দ্বারা নাট্যপ্রয়োগের ব্যবস্থা করান।" শুনিয়া বৃহস্পতি প্রমুখ দেবগণ আপত্তি তুলেন—"তাহা হইতেই পারে না। সুরাঙ্গনাগণের সহিত মানুষের মিলন অসম্ভব। বরং আচার্য্যগণ (ভরতের শতপুত্র। মর্ত্ত্যে যাইয়া আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন।" তখন নহুষ কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে বলেন—"ভগবন্! এই নাট্য আমি পৃথ্বীতলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। পুরাকালে আমারই পিতামহের (৭) ভবনে অপ্সরা শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী পিতামহের সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃপুর-বাসিদিগকে ইহার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে উর্ব্বশীর বিচ্ছেদশোকে পিতামহ উন্মাদ হইয়া যান ও তৎকালীন অন্তঃপুরিকাবৃন্দের মৃত্যুর পর এ বিদ্যা মর্ত্তে লোপ পায়, ইহা ভূতলে পুনরায় প্রকাশ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমার বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আর মর্ত্তে উহার প্রচার হইলে আপনারও যশোবিস্তার হইবে।

নহুষকে "তথাস্তু" বলিয়া আমি পুত্রগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম—"নহুষ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে মর্ত্তে নাট্য প্রয়োগ প্রবর্ত্তনের প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব তোমরা পৃথিবীতে যাইয়া নাট্য প্রয়োগ কর। উহা সফল হইলে আমি তোমাদিগের শাপান্ত ব্যবস্থা করিব। দেখিও ব্রাহ্মণগণ বা নৃপগণের পরিহাস সূচক কুৎসিত প্রয়োগের অবতারণা করিও না। স্বয়ম্ভূ যাহা সূত্রাকারে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন, আমিও সংক্ষেপে তাহারই উপদেশ দিয়াছি। ইহার বিস্তৃতি করিবার ভার রহিল কোহলের উপর।"

আমার আদেশ অনুসারে পুত্রগণ নহুষের সহিত মর্ত্তধামে গমন করিয়া নানাবিধ প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মানুষীর সহিত সম্মিশ্রণের ফলে তাঁহাদিগের বহু সন্তানাদির উৎপত্তি হয়। অনন্তর ব্রহ্মার কৃপায় তাঁহারা শাপ-মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্ত হন। কোহল, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ধূর্ত্তিল প্রভৃতি আমার পুত্রগণ মর্ত্তধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ বর্ত্তমানে নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। ঋষিশাপে ইহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বলিয়া ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের উপসংহার করিলেন।

---

১. 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা'—'উদয়ন',—শ্রাবণ) ৪০, বৈশাখ ১৩৪১; আশ্বিন ১৩৪১ দ্রষ্টব্য।

২. 'ভাবপ্রকাশন', বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৫৫-৫৮; ২৮৪-৮৭।

৩. 'ত্রিপুরদাহ' ডিম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গত শারদীয় সংখ্যার উদয়নে 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

৪. বৃত্তি চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ ৩৭৭। 'কাব্যপুরুষ ও সাহিত্য বিদ্যাবধূ' প্রবন্ধেও ইহার আলোচনা আছে। উদয়ন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃঃ ৯৬০-৯৬১।

৫. মনুর অপত্য বলিয়াই আজ আমাদের নাম 'মানব' ও 'মানুষ'।

৬. নাট্যশাস্ত্র, ৩৬ অধ্যায়, বারাণসী সংস্করণ।

৭. চন্দ্র বংশীয় মহারাজ পুরূরবাঃ নহুষের পিতামহ। পুরূরবাঃ—আয়ু—নহুষ—যযাতি—পুরু—ইহাই পুরুবংশের বংশতালিকা। পুরূরবার সহিত উর্বশীর মিলনকাহিনী কালিদাসের 'বিক্রমউর্বশী'—ত্রোটকে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

জর্জরোৎসব

গত শ্রাবণ সংখ্যার 'উদয়নে'র প্রবন্ধে ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত নাট্যোৎপত্তির উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে ইন্দ্রধ্বজমহোৎসব বা জর্জরোৎসবের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জর্জরপূজা-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

শুভ, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন নাট্যগৃহ নির্ম্মিত হইবার পর, তথায় সপ্তাহকাল গাভী ও রক্ষোঘ্ন মন্ত্রজ্ঞানক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের বাস করা প্রয়োজন। তাহার পর নাট্যগৃহে ও রঙ্গপীঠে রঙ্গদেবতাগণের অধিবাস (১)। দীক্ষিত (অর্থাৎ গৃহীতব্রত), সংযতসর্ব্বেন্দ্রিয়, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন। অখণ্ড-বস্ত্র পরিহিত নায়ক (অর্থাৎ নাট্যাচার্য্য) ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক উৎসবের পূর্ব্বদিনে নিশাগমে মন্ত্রপূত জলে আপনার সর্ব্বাঙ্গ প্রোক্ষিত করিয়া পূজাস্থানে গমনানন্তর সর্ব্বজগৎ-কারণ দেবাদিদেব মহাদেব, লোক পিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গুহ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মতি, সোম, সূর্য্য, মরুদগণ, লোকপালগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মিত্র, অগ্নি, রুদ্রগণ, কাল, কলি, মৃত্যু, নিয়তি, কালদণ্ড, বিষ্ণুর প্রহরণ, নাগরাজ বাসুকি, বজ্র, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোবৃন্দ, মুনিগণ, ভূতসঙ্ঘ, পিশাচ-যক্ষ-গুহ্যক-মহোরগ-অসুরনাট্য-বিঘ্নগণ, নাট্যকুমারীবৃন্দ, গণপতি, দেবর্ষিসমূহ ও অন্যান্য পূজনীয় দেবরাক্ষস প্রভৃতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিতভাবে আবাহন করিবেন।

"অনুচর ও অনুচরীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া আপনারা অদ্য রাত্রিতে আমাদিগের এই নাট্য-মণ্ডপে আবির্ভূত হউন ও নাট্যকর্ম্মে আমাদিগকে সাহায্য করুন।"

এইরূপ আবাহনের পর স্থণ্ডিলে (২) রঙ্গদেবতাগণের পূজা। পরে কুতপ সম্প্রয়োগ (৩) সহকারে জর্জ্জরের আবাহন। আবাহনমন্ত্র যথা, "তুমি মহেন্দ্রের প্রহরণ—সর্বদানবসূদন। হে সর্ববিঘ্ন নিবারণ; তুমি সর্বদেব নির্ম্মিত। নৃপের বিজয়, রিপুগণের পরাজয়, গোব্রাহ্মণের মঙ্গল ও নাট্যের উন্নতি তুমি সূচনা করিয়া দাও।"—এইরূপ আবাহন করিয়া যথাশাস্ত্র জর্জ্জরের পূজা কর্ত্তব্য।

রজনী প্রভাত হইলে পূজার প্রারম্ভ। আর্দ্রা, মঘা, ভরণী, পূর্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, অশ্লেষা অথবা মূলা নক্ষত্রেই বজ্রপূজা প্রশস্ত। জিতেন্দ্রিয়, শুচি, দীক্ষিত নাট্যাচার্য্যের দ্বারা এই পূজাকার্য সম্পাদনীয়।

দিনান্তে যে দারুণ ঘোর ভূতদৈবত মুহূর্ত্তে (যাহাকে আমরা সাধারণতঃ রাক্ষসী বেলা' বলি)—সেই সময়ে যথাবিধি আগমনপূর্বক দেবতাসন্নিবেশ

কর্তব্য। রক্তসূত্রের গ্রন্থিযুক্ত করন (প্রতিসর), রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, রক্তফল, যব, সিদ্ধাব, (শ্বেত-সর্ষপ); লাজ (খই), অক্ষত (আতপতণ্ডুল), শালিধান্যের তণ্ডুল, নাগপুষ্পের (৪) মূল, প্রিয়ঙ্গু (৫) প্রভৃতি দেবতানিবেশনে প্রয়োজনীয়।

প্রথমে রঙ্গ-পীঠের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে ষোড়শহস্ত পরিমিত মণ্ডপ (৬) অঙ্কন করিতে হইবে। উহার চারিদিকে চারিটি দ্বার। ঠিক মধ্যস্থলে আড়াআড়ি দুইটি রেখা-একটি উত্তর-দক্ষিণে, অপরটি পূর্ব-পশ্চিমে। ইহাতে মণ্ডপটি চারি ঘরে বিভক্ত হইল। মণ্ডপের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি ও আট বিদিকে আটটি—মোট এই মোট নয়টি পদ্ম অঙ্কিত করা কর্তব্য। কেন্দ্রস্থ পদ্মোপরি ব্রহ্মার স্থান। সর্বাগ্রে ঐশানকোণে ভূতগণ সহ মহাদেবের সন্নিবেশ করণীয়। পূর্বদিকের পদ্মে—নারায়ণ, মহেন্দ্র, স্কন্দ, সূর্য্য, অশ্বিনী-কুমারযুগল, শশী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শ্রদ্ধা ও মেধার সন্নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপে অগ্নি-কোণের পদ্মে—বহ্নি, স্বাহা, বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্বগণ, রুদ্রগণ ও গণসমূহের স্থান। দক্ষিণ পদ্মে—সানুচর যম, মিত্র, পিতৃগণ, পিশাচ, উরগ, গুহ্যক প্রভৃতি। নৈর্ঋতে—রাক্ষস ও ভূতগণ। পশ্চিম পদ্মে—যাদঃপতি বরুণ ও সমুদ্রগণ। বায়ুকোণে—সপ্তবায়ু, পক্ষিগণ সহ গরুড়। উত্তরপদ্মে—নন্দাদি গণেশ্বরগণ, ব্রহ্মর্ষিসমূহ, ভূতসঙ্ঘ প্রভৃতির যথাযথভাবে সন্নিবেশ। দক্ষিণে—পূর্বস্থিত স্তম্ভে সনৎকুমার ও দাক্ষর স্থান। উত্তর-পুর্ব স্তম্ভে (৭) গণপতির সন্নিবেশ পূজার্থ করিতে হইবে।

এইরূপে বেদনাসন্নিবেশের পর প্রকৃত কর্ম্মারম্ভ। দেবগণের উদ্দেশে শ্বেতপুষ্প, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতচন্দন প্রদানের বিধি। পক্ষান্তরে গন্ধর্ব, বহ্নি ও সূর্য্যের প্রিয় রক্তপুষ্প, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন। ইহা ছাড়া যথাবিধি অনুরূপ ধূপাদিদানেরও বিধি আছে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও ধূপদানের পর বলিপ্রদান। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন প্রকার বলি দিবার বিধান আছে। ব্রহ্মার প্রিয়-উপহার মধুপর্ক (৮)। সরস্বতীর পায়স। শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের তৃপ্তি মোদকে। অগ্নির উপহার ঘৃতাক্ত অন্ন। চন্দ্র সূর্য্যের গুড় মিশ্রিত অন্ন। বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্ব ও মুনিগণ মধু ও পায়স ভালবাসেন। যম ও মিত্রের উদ্দেশে অপূপ ও মোদক উপহার বিধি। পিতৃগণ, পিশাচ, উরগ, প্রভৃতিকে ঘৃত ও দুগ্ধ প্রদান করা কর্তব্য। ভূতগণের প্রিয় উপহার হইতেছে পক্কান্ন, মাংস, ফলের আসব, সুরা, সীধু, চণক ও পলল (৯) রাক্ষসগণের উদ্দেশে পক্কান্ন ও মৎস্য প্রদেয়। দানবগন সুরা ও মাংস ইচ্ছা করেন। অন্যান্য দেবগণের নিমিত্ত

অপূপ, উৎকরিকা (১০) ও অন্ন উৎসর্গ করা বিধেয়। সাগর ও নদীগণকে মৎস্য ও পিষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা পূজা করা উচিত। বরুণের পূজায় ঘৃতপায়স অবশ্য দেয়। মুনিগণকে নানাবিধ ফলমূলের দ্বারা পায়স অবশ্য দেয়। মুনিগণকে নানাবিধ ফলমূলের দ্বারা পূজা করিতে হইবে। বায়ুগণ ও পক্ষি-সমূহের উদ্দেশে বিচিত্র ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্য (২১) দাতব্য। নাট্যমাতৃকাগণ ও সানুচর ধনদ কুবের অপূপ, ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্যের দ্বারা পূজনীয়। এইরূপে যিনি যেমন দেবতা, তাঁহার সেইরূপ নৈবেদ্যের বিধান নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যের বিধান নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের উদ্দেশে বলি প্রদানের সময় বিশেষ বিশেষ মন্ত্রপাঠ করিতে হয়, বাহুল্যভয়ে সকল মন্ত্রের পরিচয় এস্থলে দেওয়া হইল না। কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই চারিটি মন্ত্রের ভাবার্থ প্রদর্শিত হইল।

সর্বপ্রথমেই ব্রহ্মার আবাহন—"হে দেবদেব, মহাদেব, সর্বলোকপিতামহ! মদ্দত্ত এই সকল মন্ত্রপূত বলি প্রদান—"হে পুরন্দর, অমরপতে, বজ্রপাণে, শতক্রেতো! বিধিপূর্বক প্রদত্ত সমন্ত্রক এই বলি গ্রহণ কর!" অনন্তর স্কন্দের পূজা—"হে ভগবন, দেবসেনাপতে, ষন্মুখ, শঙ্করপ্রিয়, স্কন্দ! প্রীত মনে এই বলি গ্রহণ কর।" এইবার নারায়ণের পালা—"হে অমিতগতি সুরোত্তম, পদ্মনাভ, নারায়ণ। আমার প্রদত্ত এই মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ কর।" ইহার পর শিবার্চনা। —"হে দেবদেব, মহাদেব, গণাধিপতে, ত্রিপুরান্তক! মৎপ্রদত্ত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ কর।" পরে বিঘ্ননাশার্থ গণেশের আবাহন—"হে দেবদেব, মহাযোগিন, সুরোত্তম! দেব, তুমি বলি গ্রহণ করিয়া রঙ্গমণ্ডপকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা কর।" অনন্তর সরস্বতীকে বলিপ্রদান—হে দেবদেবি, মহাভাগে হরিপ্রিয়ে সরস্বতি। হে মাতঃ! ভক্তিপূর্বক আমি এই বলি প্রদান করিতেছি, কৃপা করিয়া তুমি গ্রহণ কর।" ইত্যাদি।

রঙ্গপীঠের মধ্যস্থলে জলপূর্ণ পুষ্পমাল্যাদিশোভিত কুম্ভ স্থাপন করা কর্তব্য। কুম্ভমধ্যে সুবর্ণ দিতে হয়।

এইরূপে যথাক্রমে বাদ্যধ্বনি-সহকারে গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্র, ধূপ, ভোজ্য প্রভৃতি উপচারের দ্বারা সকল দেবতার পূজা শেষ করিয়া জর্জরের পূজা আরম্ভ করিতে হয়; তাহা হইলে বিঘ্ন জর্জরিত হইয়া থাকে।

জর্জরের মোট পাঁচটি পর্ব। উপর দিক হইতে প্রথম পর্বে ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে শঙ্কর, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে স্কন্দ ও পঞ্চমে মহানাগগণের অধিষ্ঠান। মাথার

পর্বটি শ্বেতবস্ত্রে, রুদ্রাধিষ্ঠিত পর্ব নীলবস্ত্রে, তৃতীয় বিষ্ণু পর্ব পীতবস্ত্রে। চতুর্থ স্কন্দ পর্ব রক্তবস্ত্রে ও মূলপর্বটি বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রে মণ্ডিত করিতে হয়। প্রতি পর্বের অধিষ্ঠাতা দেবগণের পূজায় অনুরূপ গন্ধ, মাল্য, ধূপ, ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রদান করা কর্তব্য। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইলে বিঘ্ন জর্জরার্থ জর্জরের অভিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। উহার মন্ত্র, যথা—"এই রঙ্গালয়ের বিঘ্ন বিনাশার্থ বজ্রসার, মহাধনু, মহাবীর্য্য তুমি পিতামহপ্রমুখ সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছ। সর্বদেবগণসহ ব্রহ্মা তোমার শিরোদেশ রক্ষা করুন। দ্বিতীয় পর্ব রক্ষা করুন হর। তৃতীয় জনার্দন। চতুর্থ কুমার ও পঞ্চম পন্নগশ্রেষ্ঠগণ। সকলে নিত্য তোমায় রক্ষা করুন। তুমি আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হও। হে অরিসূদন! শ্রেষ্ঠ অভিজিৎ নক্ষত্রে তোমার উৎপত্তি। রাজার জয় ও অভ্যুদয় তুমি সূচনা করিয়া দাও।"

জর্জর পূজা বলিদানের পর অগ্নিতে হোম। পরে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি-সহকারে প্রদীপ্ত উল্কার সাহায্যে নৃপতি ও নর্ত্তকীগণের দীপ্তির অভিবর্দ্ধন। অতঃপর মন্ত্রপূত জলে তাঁহাদের অভ্যুক্ষণ ও আশীর্বাদ। মন্ত্র যথা—"সরস্বতী, ধৃতি, মেধা, হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী, মতি ও সৌম্যরূপা মাতৃকাগণ তোমাদিগের রক্ষা ও সিদ্ধি বিধান করুন।"

হোমের পর নাট্যাচার্য্য পূর্বস্থাপিত কুম্ভটি ভাঙিয়া ফেলিবেন। কুম্ভ যদি অভগ্ন থাকে, তবে রাজার শত্রুভয় ঘটে। আর ভগ্ন হইলে শত্রুনাশ ঘটে।

কুম্ভ ভাঙিবার পর নাট্যাচার্য্য নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীসহ দীপ্তা দীপিকার সাহায্যে সমস্ত রঙ্গস্থল প্রদীপিত করিবেন। প্রদীপ্ত উল্কাটি সশব্দে ঘুরাইবার সময় শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি সকল প্রকার বাদ্যই বাজিতে থাকিবে।

অবশেষে রঙ্গযুদ্ধ। এই রঙ্গযুদ্ধে শুভনিমিত্ত সকল দৃষ্টিগোচর হইলে রাজার ভাবী শুভ বুঝিতে হইবে। অন্যথায় জনপদ, নৃপ ও নাট্যের অশুভ অবশ্যম্ভাবী ইহাই সূচিত হইয়া থাকে।

ইহাই হইল রঙ্গদেবতাগণের ও জর্জ্জরের পূজা পদ্ধতি। এই নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ করিলে বা কোন বিশিষ্ট দৃশ্যকাব্যের নূতন অভিনয় করিতে ইচ্ছা হইলে নাট্যাচার্য্য মহাশয়ের রঙ্গপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। রঙ্গপূজা না করিয়া কদাপি নাট্যগৃহে নূতন অভিনয় করিতে নাই। করিলে অভিনয় নিষ্ফল হয় ও অভিনেতা —অভিনেত্রীবৃন্দ তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, যথাবিধি রঙ্গপূজাদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

জর্জ্জরদণ্ড কিরূপে নির্ম্মিত হইত। তাহারও সম্পূর্ণ বিবরণ ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ বা বংশ—এ উভয়ই জর্জ্জরের উপাদান হইতে পারে। যে কোন বৃক্ষের চারা হইতেই জর্জ্জরদণ্ড প্রস্তুত করা চলে। তথাপি ভরতের মতে বেণুনির্ম্মিত জর্জ্জরই শ্রেষ্ঠ। পুণ্যভূমিতে উৎপন্ন বৃক্ষ বা বংশ শুভ নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া শিল্পীর নিকট জর্জ্জর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দিতে হইবে। জর্জ্জর দীর্ঘ হইবে ১০৮ অঙ্গুলি। উহাতে পাঁচটি পর্ব্ব (পাব) ও চারিটি গ্রন্থি (গাঁট) থাকিবে। করতল প্রমাণ উহার বিস্তৃতি। পর্ব্বগুলি যাহাতে বেশী সরু বা মোটা না হয়। সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দণ্ডটি সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। স্থূলগ্রন্থিযুক্ত, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, বক্র, কীটদষ্ট, কৃমিক্ষত পর্ব্বা (ঘুনধরা) অথবা পরিমাণ হ্রস্ব বংশ বা বৃক্ষ প্ররোহ হইতে জর্জ্জর নির্ম্মাণ করিতে মহর্ষি ভরত নিষেধ করিয়াছেন। মধু ও ঘৃত মাখাইয়া মাল্য-ধূপাদির দ্বারা পূজাপূর্ব্বক বেণু গ্রহণ করিয়া জর্জ্জর নির্ম্মাণের আয়োজন করিতে হইবে। যে শিল্পী জর্জ্জর নির্ম্মাণ করিবেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইতে হইবে। রুগ্ণ, কুরূপ বা বিকলাঙ্গ শিল্পীকে দিয়া জর্জ্জর নির্ম্মাণের বিশেষ নিষেধ নাট্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ পুণ্য দিনে, শুভ নক্ষত্রে, শুভ মুহূর্ত্তে, পুণ্যক্ষেত্রে উৎপন্ন সুলক্ষণযুক্ত বেণুদণ্ড হইতে লক্ষণান্বিত শিল্পীদ্বারা নির্ম্মিত জর্জ্জর নূতন রঙ্গগৃহে স্থাপন করিলে নাট্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ইহার বিপরীতে অশুভ ফলই ফলিয়া থাকে—ইহাই ভরতমুনির অভিপ্রায়।

---

১. অধিবাস—মূল পূজা বা যজ্ঞ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবতাদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, তৈল—হরিদ্রা, বরণডালা, শ্রী, আইভাঁড় প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সংস্কার, প্রতিষ্ঠান ও পূজাকরণের নাম অধিবাস বা অধিবাসন।

২. স্থণ্ডিল—যজ্ঞার্থ সমীকৃত পরিষ্কৃত ভূভাগ।

৩. কুতপ—চতুর্ব্বিধ আতোদ্য ভাণ্ডাদির একত্র নিবেশনের নাম কুতপ—ইহাই অভিনবগুপ্তের অভিমত। এক কথায় কুতপ—Orchestra

ভাণ্ড—ঢক্কাজাতীয় বাদ্য। মৃদঙ্গ (মুরজ), যশঃ পটহ (ঢক্কা), পটহ (আনক), ভেরি (দুন্দুভি), পণব, মর্দ্দল, ডিণ্ডিম, ডমরু প্রভৃতি পুষ্কর জাতীয় বাদ্য ইহার অন্তর্গত। আতোদ্য মোট চারিপ্রকার—(ক) তত—তন্ত্রাগত বাদ্য —তাঁতের বা তারের যন্ত্র বীণাদি (খ) সুষির বা শুষির—হাওয়ার যন্ত্র—বংশী প্রভৃতি। (গ) ঘন—ধাতববাদ্য—কাংস্যতালাদি। (ঘ) অবনদ্ধ বা অনদ্ধ—

—পুষ্করবাদ্য—মুরজাদি। এই চতুর্বিধ বাদ্যসমষ্টিকে বাদিত্র আতোদ্য বা কুতপ বলা হইত।

৪. নাগপুষ্প—অভিনবগুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—নাগদন্ত (একপ্রকার সূর্যামুখী) অথবা নাগরন্ত (নাগরঙ্গ)—কমলালেবু। আমাদিগের মনে হয়, ইহা চম্পক, পুন্নাগ বা নাগকেশরকেও বুঝাইতে পারে।

৪. প্রিয়ঙ্গু একপ্রকার পুষ্প? সংস্কৃত কাব্যে প্রসিদ্ধ আছে যে ইহা স্ত্রীলোকের স্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কুঙ্কুম (জাফরাণ) মাত্র।

৬. নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্ত (খ্রীঃ ১০ম ১১শ শতাব্দী) বলেন, মণ্ডলের মোট দৈর্ঘ্য ষোড়শ হস্ত। মণ্ডলটি সমচতুরস্র (square)। অতএব, উহার প্রতি পার্শ্ব (side) চারি হাত দীর্ঘ।

৭. যদিও মূলে দক্ষিণ ও উত্তর স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ আছে তথাপি অভিনবগুপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৮. মধুপর্ক—সমপরিমাণ চিনি, ঘৃত ও দধির সহিত অধিক পরিমাণ মধু ও অল্প পরিমাণ মধু—অল্প পরিমাণ জল মিশাইলে মধুপর্ক হয়। কাংস্যপাত্রে মধুপর্কদানের বিধিতে অপুপ পিঠা পুলি প্রভৃতি। মোদক—মোয়া।

৯. আসব—অপক্ব ঔষধ ও জলে সিদ্ধ মদ্য বিশেষ। সীধু (শীধু)—পক্ব ইক্ষুরসে সিদ্ধ মদ্য বিশেষ। আর অপক্ব ইক্ষুরসজাত সীধুর অপর নাম শীতরস। ইহা রাজবল্লভের মত। মাধবের মতে—পক্বইক্ষুরসজাত মদ্য সীধু ও অপক্ব মদ্য আসব। সুরা—শালি, ষষ্টি কপীষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যজাত মদ্য বিশেষ। চণক-চাণা। পলল—মাংস অথবা তিলকুটা। মাংস পূর্বে উক্ত হওয়ায় তিলকুটা অর্থই এস্থলে গ্রাহ্য।

১০. উৎকারিকা—দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ।

১১. আহার ষড়্‌বিধ—(ক) চুষ্য—যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—ইক্ষুদণ্ডাদি। (খ) পেয়—যাহা পান করা যায়—তরলখাদ্য—সরবৎ, মিছরির জল, দুগ্ধ ইত্যাদি। (গ) লেহ্য—যাহা চাটিয়া খাইতে হয়—চাটনী প্রভৃতি (ঘ) ভোজ্য—সাধারণ ভোজনযোগ্য বস্তু—ভাত, ডাল, ঝোল, ইত্যাদি। (ঙ) ভক্ষ্য —অপেক্ষাকৃত খর ও কঠিন খাদ্য। লাড্ডু, মোয়া প্রভৃতি। (চ) চর্ব্য—যাহা বিশেষভাবে চিবাইতে হয়—অতিশয় রুক্ষ ও শুষ্ক কঠিন খাদ্য—মুড়ি, ছোলা-ভাজা ইত্যাদি।

ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা

গত বৈশাখ সংখ্যায় 'উদয়নে'র প্রবন্ধে ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত জর্জ্জর পূজা পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেবভাষার আদি দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

ব্রহ্মার আদেশে দেবলোকে দুর্ভেদ্য নবনাট্যগৃহ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্মাণ করিলেন। পিতামহের সামপ্রয়োগে দেব ও দৈত্যগণের বিবাদ আপোষে মিটিয়া গেল। তাহার পর ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে বিঘ্নশান্তির উদ্দেশ্যে জর্জ্জরের পূজা সম্পাদিত হইল। অনন্তর মহর্ষি ভরত পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব! আদেশ করুন, কোন্ দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ করিব?" ব্রহ্মা 'অমৃতমন্থন' নামক 'সমবকারের অভিনয় করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এ অভিনয় এতই স্বাভাবিক ও মনোরম হইয়াছিল যে, দেবাসুরগণ তাঁহাদিগের পূর্ববৈর বিস্মৃত হইয়া একত্রে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই অমৃতমন্থন সমবকারকেই দেবভাষার আদি দৃশ্যকাব্য বলা বলে। ইহার রচয়িতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভরতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"অদ্য দেবাদিদেব মহাদেবকে নাট্য-প্রয়োগ দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব তুমি প্রস্তুত হইয়া লও।" ইহার পর ব্রহ্মা, অমরবৃন্দ ও ভরত সদলে মহাদেবের আবাসে গমন করিলেন। তথায় ত্রিলোচনের পূজা পূর্ব্বক পিতামহ অভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন। উমাপতি সানন্দে অভিনয় দর্শনে সম্মত হইলেন। তদনুসারে হিমাচল পৃষ্ঠে অমৃতমন্থন সমবকারের পুনরভিনয়ের আয়োজন হইল। সমবকারের সহিত 'ত্রিপুরদাহ' নামক একখানি 'ডিম্'ও অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই ত্রিপুরদাহ ডিমখানিও পিতামহের রচনা। অভিনয়দর্শনে মহাদেব ও ভূতগণ পরম প্রীত হইয়াছিলেন। মহর্ষি ভরত নাট্যমধ্যে ভারতী, সাত্ত্বতী ও আরভটিবৃত্তির নিবেশ সম্যগরূপেই করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেবাদিদেবের নৃত্তদর্শনে কৈশিকী প্রয়োগের ইচ্ছাও ভরতের মনে জন্মিয়াছিল। আর সেই উদ্দেশ্যে কৈশিকী প্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ প্রার্থনা করায় পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যালঙ্কার-চতুরা অপ্সরা-গণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (১) কিন্তু সম্যগ উপদেশের অভাবে ভরত নাট্য-মধ্যে সুমিষ্টভাবে কৈশিকী প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। ভরতের এই ক্রটিটুকু দেখিয়া দেবাদিদেব কৃপা-পরবশ হইয়া পিতামহকে বলিলেন—"হে

মহামতি! আপনার সৃষ্ট নাট্যাভিনয় অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা যশস্য, পবিত্র, মঙ্গলকর ও বুদ্ধিবর্দ্ধক। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমিও যথাসময়ে অঙ্গবিক্ষেপ করিতে করিতে নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছি। (২) এই নৃত্য নানাবিধ করণ সংযুক্ত অঙ্গহারসমূহের দ্বারা বিভূষিত। অতএব পূর্ব্বরঙ্গমধ্যে আপনি ইহা নিবেশিত করিয়া দিন। এখন যে পূর্ব্বরঙ্গ প্রযুক্ত হইতেছে, ইহা বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় "শুদ্ধ নামে প্রচলিত আছে। নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা "চিত্রপূর্বরঙ্গ" নামে বিখ্যাত হইবে (৩)।

মহাদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হে দেবাদিদেব অঙ্গহারের প্রয়োগ আপনিই শিক্ষা দিন।" তখন মহেশ্বর তণ্ডু (অর্থাৎ নন্দীকে) সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি ভরতকে অঙ্গহারপ্রয়োগ শিক্ষা দাও।" তদনুসারে তণ্ডু ভরতমুনিকে নৃত্যশিক্ষা দিলেন। তণ্ডুর নিকট ভরত শিক্ষা লাভ করিয়া পূর্বরঙ্গের অঙ্গরূপে করণ—অঙ্গহার-রেচক-পিণ্ডীবন্ধ সংযুক্ত অপূর্ব তাণ্ডব নৃত্য যোগ করিয়া দিলেন। তণ্ডু প্রথম এই নৃত্যের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া নটরাজের আবিষ্কৃত নৃত্যের নাম হইল "তাণ্ডব" নৃত্য। (৪) পরে ইহাতে ভগবতীর আবিষ্কৃত সুকুমার অঙ্গহার সম্পন্ন 'লাস্য' নৃত্যও সংযোজিত হইয়াছিল। এইরূপে নৃত্ত, নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সংযোগে দেবলোকের অভিনয় ক্রমশঃ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল।

সমবকার ও ডিম—শব্দ দুইটি একটু অপরিচিত ঠেকিতে পারে। উহাদিগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ দৃশ্যকাব্যকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) রূপক, (২) উপরূপক। রূপক আবার দশবিধ (১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) অঙ্ক (উৎসৃষ্টিকাঙ্ক), (৪) ব্যায়োগ, (৫) ভাণ, (৬) সমবকার (৭) বীথী, (৮) প্রহসন, (৯) ডিম, (১০) ঈহামৃগ। (৫)

উপরূপক আবার অষ্টাদশ প্রকার। অবশ্য এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এইটুকু মাত্র বক্তব্যই পর্য্যাপ্ত যে, সমবকার ও ডিম—দুই প্রকার দৃশ্য কাব্য মাত্র। ইহাদিগের নাট্য শাস্ত্রোক্ত সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এখানে দেওয়া গেল।

সমবকার—নানাবিধ বিষয় চারিদিকে ইতস্ততঃ সমাকীর্ণ হয় বলিয়া এই শ্রেণীর রূপকের নাম হইয়াছে 'সমবকার'। ইহা দশরূপকের টীকাকার ধনিকের মত। নাট্যদর্পণের মতে—সঙ্গত ও অবকীর্ণ অর্থ (প্রসিদ্ধ ত্রিবর্গোপায়) দ্বারা

গ্রথিত দৃশ্যকাব্যই সমবকার (৬)। ইহার বস্তুভাগ অতি প্রসিদ্ধ দেবাসুর—যুদ্ধবীজমূলক হওয়া প্রয়োজন। নাটকাদি রূপকের মত ইহাতেও আমুখ (অর্থাৎ প্রস্তাবনা—prologue) সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও নির্বহণ—এই চারিটি সন্ধি ইহাতে থাকিবে কিন্তু বিমর্শ সন্ধি থাকিবে না। (৭) প্রখ্যাত উদাত্ত চরিত্র নায়ক দেব ও দানব মিলিয়া দ্বাদশটি (৮)। ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ফললাভের উল্লেখ থাকিবে (যেমন) সমুদ্রমন্থনে নারায়ণের লক্ষ্মীলাভ, ইন্দ্রের ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রাপ্তি ইত্যাদি। সমগ্র গ্রন্থখানির বিষয় অষ্টাদশ নাড়িকা পরিমিত সময়-নিষ্পাদ্য হওয়া উচিত (৯) অঙ্ক মোট তিনটি। প্রথমাঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধিদ্বয় থাকিবে, ও ইহা দ্বাদশ নাড়ী পরিমিত হইবে। দ্বিতীয়াঙ্কে গর্ভ সন্ধি—উহা চারি নাড়িকা পরিমিত। তৃতীয়াঙ্কে নির্বহণ সন্ধি (উপসংহার)—উহার স্থিতিকাল দুই নাড়ী। ভারতী সাত্বতী ও আরভটি বৃত্তি যথাযোগ্য নিবেশিত হইবে; কিন্তু কৈশিকী বৃত্তি থাকিবে খুব অল্প। বীররস হইবে অঙ্গী (প্রধান); রৌদ্ররসও প্রচুর পরিমাণে থাকিবে। অন্য রসগুলি অঙ্গরূপে অবস্থিতি করিবে। প্রতি অঙ্ক প্রহসনময় হওয়া প্রয়োজন। বীথী নামক রূপকের নৃত্যগীত বহুল ত্রয়োদশটি অঙ্গ আবশ্যক মত উপন্যস্ত হইবে। বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে না (১০)। সমবকারে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে গায়ত্রী প্রভৃতি সাধারণতঃ অপ্রচলিত কুটিল ছন্দের বহুল প্রয়োগ থাকিবে। মতান্তরে—স্রগ্ধরা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বহ্বক্ষর ছন্দের সন্নিবেশ কর্ত্তব্য; গায়ত্রী প্রভৃতির নহে। গায়ত্রী প্রভৃতির প্রয়োগ থাকিবে কিনা—এ-সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাঠান্তর নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন পাঠটি গ্রহণীয়, তাহা বলা বড় কঠিন। আর থাকিবে তিন প্রকারের শৃঙ্গার, বিদ্রব ও কপট। এ স্থলে একটি প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কামোপভোগবহুলা কৈশিকী বৃত্তির স্থান সমবকারে প্রায় নাই বলিলেই চলে। অথচ এ স্থলে বলা হইতেছে যে, উহাতে ত্রিবিধ শৃঙ্গার থাকিবে। এ পূর্বাপর—বিরোধের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? নাট্যদর্পণে ইহার অতি সুন্দর সমাধান দেওয়া হইয়াছে। শৃঙ্গার বলিলে মাত্র কামকেই শুধু বুঝায় না। শৃঙ্গারের অর্থ অর্থবিলাসোৎকর্ষ। 'বিলাস' শব্দের মোটামুটি অর্থ শোভা। অবস্থিতি, উপবেশন, গমন, হস্তভ্রূনেত্রাদি কর্মের বিশেষ ভাবের নাম বিলাস। ইহা নায়িকার স্বভাবজ অলঙ্কার। অথচ ধীরা দৃষ্টি, বিচিত্রা গতি ও সস্মিত বাক্যের

নাম বিলাস। ইহা সাত্ত্বিক নায়কের গুণ। অতএব সমবকারে শৃঙ্গার থাকিলেও কৈশিকী বৃত্তি অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান। ত্রিশৃঙ্গার, ত্রিবিদ্রব ও ত্রিকপট—শব্দগুলি পারিভাষিক। ইহাদিগের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ত্রি-শৃঙ্গার—(১) ধর্মশৃঙ্গার, (২) অর্থ-শৃঙ্গার (৩) কামশৃঙ্গার। ধর্মশৃঙ্গার —ধর্মই ইহার হেতু ও ফল। যে স্থলে অভিলাষের মূল ধর্মে পর্যবসিত, যাহার দ্বারা সংসারের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়, অর্থাৎ যে স্থলে কাম ব্রত-নিয়ম-তপস্যার দ্বারা সংযত, গুণধান, অপত্যোৎপাদন যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ও ইন্দ্রিয় সুখ যে স্থলে আনুষঙ্গিক ফল, তাহাই ধর্মশৃঙ্গার মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। ধর্মপত্নী—সংযোগেই এ স্থলে শৃঙ্গার শব্দের অর্থ। এইরূপ মনোমত ধর্মপত্নী লাভের হেতু দানাদিধর্মানুষ্ঠান। পরদারবর্জনরূপ ধর্ম ইহার ফল। শারদাতনয় ধর্মশৃঙ্গারের পাঠান্তর ধরিয়াছেন—ভোগ-শৃঙ্গার। অর্থশৃঙ্গার-অর্থই ইহার হেতু ও ফল। যে স্থলে অর্থের ইচ্ছাবশে বহুপ্রকারে কামোপভোগ সম্ভব হয়, অর্থাৎ যে স্থলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফলে রাজ্য, সুবর্ণাদি ধন, শস্য, বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বিভবভোগ-সুখের উৎপত্তি দৃষ্টহয়, তাহাই অর্থ-শৃঙ্গার। বেশ্যাদিতে বিটাদি পুরুষগণ যে আসক্ত থাকে, অর্থই তাহার হেতু। সাধারণত পণ্যাঙ্গনাগণ যে পুরুষানুরক্ত হয় তাহার ফল অর্থপ্রাপ্তি। অর্থ বলিতে প্রার্থনীয় পরোপকার প্রতিপালন প্রভৃতি—এরূপ অর্থও নাট্যদর্পণে দৃষ্ট হয়। পরোপকারার্থ বিবাহাদি অর্থ-শৃঙ্গার মধ্যে গণ্য। কামশৃঙ্গার—"শৃঙ্গার" ও "কাম" শব্দের অর্থ (১) রতি ও (২) কাম তদ্ধেতুক স্ত্রী-পুরুষাদি। কামই যাহার হেতু ও ফল তাহাই কাম-শৃঙ্গার। রতিরূপ কাম স্ত্রী-পুরুষাদি রূপ শৃঙ্গারের হেতু। আবার স্ত্রী-পুরুষাদি-রূপ কাম রতিরূপ শৃঙ্গারের হেতু। এ স্থলে পরকীয়া বা কন্যা নায়িকা; বেশ্যা বা ধর্মপত্নী নহে। অবৈধ অভিরতি, কন্যাবিলোভন, দ্যূত, সুরা পান, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসন কামশৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যদর্পণে 'কামশৃঙ্গার' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে প্রহসন-শৃঙ্গার। এ অর্থ নাট্যশাস্ত্রাদিতে উক্ত হয় নাই। নাট্য-দর্পণে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ইন্দ্র ও অহল্যা সংবাদ। তবে এই প্রসঙ্গে প্রহসন হাস্যোদ্রেককর ব্যাপার সন্নিবেশ করিবার রীতি সর্বত্রই উক্ত হইয়াছে। এক একটি শৃঙ্গার এক এক অঙ্কে নিবেশণীয়। সাহিত্যদর্পণ ও নাট্যদর্পণের মতে কামশৃঙ্গার প্রথমাঙ্কেই প্রদর্শনীয়। অবশিষ্ট দুইটির সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

ত্রিবিদ্রব—বিদ্রব শব্দের অর্থ অনর্থ। যাহা হইতে ভয় পাইয়া লোক

বিদ্রুত হয় (অর্থাৎ পলায়ন করে) তাহাই বিদ্রব। বিদ্রব নামে গর্ভ সন্ধির একটি অঙ্গ আছে। শঙ্কা-ভয়-ত্রাস-কৃত সম্ভ্রমই বিদ্রব। দশরূপক ও ভাব-প্রকাশন উহা বিমর্শ সন্ধির অঙ্গ বলিয়া ধরিয়াছেন। বন্ধন, বধ প্রভৃতি এই বিদ্রবের স্বরূপ। নাট্যশাস্ত্রের মতে ত্রিবিধ বিদ্রব—(১) যুদ্ধজল-সম্ভূত, (২) বায়ু, অগ্নি, গজেন্দ্র প্রভৃতি সম্ভূত। (৩) নগরোপরোধজনিত। দশরূপকেও অনেকটা এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হবয়াছে—নগরোপরোধ, যুদ্ধ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিদ্রব মধ্যে গণ্য। শারদাতনয় নাট্যশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। নাট্যদর্পণের মতে ত্রিবিদ্রব। যথা—(১) জীবজ (যেমন হস্তী প্রভৃতি হইতে) (২) অজীবজ (যেমন শাস্ত্রাদি হইতে), (৩) জীবাজীবজ (যেমন নগরোপরোধ হইতে)। নগরোপরোধ প্রভৃতিতে চেতন ও অচেতন উভয়কৃত বিদ্রবই বর্তমান। সাহিত্যদর্পণে ত্রিবিদ্রব লক্ষণ এই রূপই প্রদত্ত হইয়াছে। —(১) অচেতন কৃত, (২) চেতনকৃত, (৩) চেতনাচেতন কৃত। উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—গজাদি। অবশ্য কেবল চেতনাচেতনের ব্যাখ্যা নাট্যদর্পণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা সাহিত্যদর্পণের বিবরণ অপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এই ত্রিবিধ বিদ্রবের মধ্যে এক প্রকার বিদ্রব এক একটি অঙ্কে প্রদর্শনীয়।

ত্রিকপট—শারদাতনয়ের মতে কপটের স্বরূপ মহাত্মক ভ্রম। নাট্যদর্পণে ইহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। যাহা মিথ্যাকল্পিত, অথচ আপাত-দৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় তাহাই কপট। নাট্যশাস্ত্রের মতে ত্রিকপট, যথা—(১) অতিক্রম বিহিত (অর্থাৎ বস্তু স্বভাবজনিত), (২) দৈববিহিত, (৩) শত্রুকৃত, কপটের দ্বারা সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দশরূপক মতে ত্রিকপট, যথা—(১) বস্তুস্বভাব কপট—ক্রুর প্রকৃতির প্রাণী হইতে ইহার উৎপত্তি (২) দৈবিক কপট—অগ্নি, বৃষ্টি, বাত্যা প্রভৃতি সম্ভূত, (৩) শত্রুজ—সংগ্রামাদি জনিত। শারদাতনয়ও ঐরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণের মতে ত্রিকপট যথা —(১) স্বাভাবিক, (২) কৃত্রিম, (৩) দৈবজ। নাট্যদর্পণে ত্রিকপটের একটু নূতন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। (১) বঞ্চ্যসম্ভূত কপট—যাহাকে বঞ্চনা করা হইয়াছে তাহার যদি অপরাধ থাকে। তবে বঞ্চ্যোত্থ কপট হইবে; (২) বঞ্চকসম্ভূত—যদি বঞ্চনীয় ব্যক্তি নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে বঞ্চকোত্থ কপট হইয়া থাকে; (৩) দৈবসম্ভূত—যে স্থলে বঞ্চিত ও বঞ্চক উভয়েই

নিরপরাধ, কেবল কাকতালীয় ন্যায়ে এক পক্ষ বঞ্চিত ও অপরপক্ষ বঞ্চকরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই দৈবোত্থ কপট।

বিদ্রব, ত্রিবিদ্রব ও ত্রিকপটের তিন তিনটি ভেদের এক একটি ভেদ এক এক অঙ্কে নিবেশনীয়—ইহা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে তন্মধ্যে কপট হইতেছে উপায়; বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই বিদ্রব বা পলায়ন; আর শৃঙ্গার হইল ফল।

অতএব সমবকারের সংক্ষিপ্ত সহাস্য ত্রিবিধ শৃঙ্গার, বিদ্রব, কপট থাকা প্রয়োজন। দেবাসুর—শত্রুতাজনিত যুদ্ধই ইহার মূল বস্তুভাগ। অলৌকিক নানাবিধ ঘটনার দ্বারা এই মূল বস্তুর পরিপুষ্টি সাধনকরা অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ হইলেই রূপকখানি সহৃদয় দর্শক-সমাজের সন্তোষজননে সমর্থ হইয়া থাকে। নাট্যশাস্ত্রে ও ভাবপ্রকাশনে ইহার উদাহরণ স্বরূপ 'অমৃতমন্থনের নাম করা হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার 'সমুদ্রমন্থন' বলিতে বোধ হয় ইহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

সমবকারের ন্যায় ডিমও একপ্রকার রূপক। ইহার বর্ণনীয় বস্তু বা ইতিবৃত্ত অতি প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, মহোরগ, অসুর, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সকল জাতীয় পুরুষই ইহার নায়ক। নায়কের সংখ্যা ইহাতে ন্যূনাধিক ষোড়শ—সকলেই প্রখ্যাত ও উদাত্ত চরিত্র—মতান্তরে ধীরোদ্ধত (অর্থাৎ মানুষ অপেক্ষা ইঁহারা উদ্ধত হইলেও স্বজাতির তুলনায় উদাত্তই বটেন)। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গাররসবর্জিত। নাট্যদর্পণের মতে করুণ রসও ইহাতে বর্জনীয়। রৌদ্র রসই অঙ্গী; অপর রসগুলি অঙ্গ হইলেও বেশ দীপ্তভাবেই থাকিবে। অঙ্ক চারিটি। সন্ধিও চারিটি। বিমর্শ সন্ধি ইহাতে নাই। শারদাতনয়ের মতে ইহাতে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকিবে। সাহিত্য-দর্পণের মতে থাকিবে না। নাট্যদর্পণের মতে ইহাতে চুলিকা, অঙ্কাবধার ও অঙ্কমুখ নামক তিনটি অর্থোপক্ষেপকের নিবেশ করিতে হইবে (১১)। অপঘাত চন্দ্র-সূর্যোর গ্রহণ, উল্কাপাত, বাহু ও অস্ত্রযুদ্ধ, বাহবাস্ফোট, মায়া, ইন্দ্রজাল উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা, বহু পুরুষের পরস্পর সংঘর্ষ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা ইহাতে বিশেষ-ভাবে সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। অতএব রচনামধ্যে সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তির বাহুল্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতী বৃত্তির প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শৃঙ্গাররস বর্জিত বলিয়া ডিমে কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহার নাই (১২)।

"অমৃতমন্থন সমবকার" ও "ত্রিপুরদাহ ডিম"—এই দুইখানি রূপকই স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মার রচনা—ইহা নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে

দুইখানির একখানিও বর্ত্তমানে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। শারদাতনয় আর দুইখানি ডিমের নাম করিয়াছেন—"বৃত্রোদ্ধরণ" ও "তারকোদ্ধরণ"। এই দুইখানির রচয়িতা কে, তাহার উল্লেখ শারদাতনয় করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, দুইখানি ডিমই অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে মহাকবি ভাসের (যিনি কালিদাসেরও পূর্ববর্ত্তী) রচিত একখানি অতি সুপাঠ্য সমবকার পাওয়া গিয়াছে ইহার নাম "পঞ্চরাত্র"। মহাভারতের বিরাটপর্বীয় উত্তর গোগৃহের ঘটনা অবলম্বনে উহা রচিত। কিন্তু মহাকবি রূপক মধ্যে বহু নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৎসরাজ নামে একজন কবি "অমৃতমন্থন" নামে একখানি সমবকার ও "ত্রিপুরদাহ" নামে একখানি ডিম নূতন করিয়া রচনা করিয়াছেন। পিতামহ রচিত রূপক দুইখানির সহিত এই অভিনব রূপক দুইখানির নামের মিল আছে। কবি বৎসরাজ ছিলেন কলিঞ্জর পতি পরমাচ্ছিদেবের (খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত) অমাত্য। গ্রন্থ দুইখানি সম্প্রতি বরোদার "গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সংস্কৃত গ্রন্থমালার" "রূপক-ষট্‌কম্" নামক গ্রন্থমালা মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। ভাসের পঞ্চরাত্রও ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন।

১. মূলে আছে—"ময়া পীদং স্মৃতং নৃত্যং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা" (৪।১৩৯ ইহার অর্থ - মহাদেব নৃত্তাকলার স্মর্ত্তা মাত্র, কর্ত্তা নহেন। নৃত্য অনাদি। মূলে 'নৃত্য' এই পাঠ থাকিলেও অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকায় 'নৃত্ত' এই পাঠ করিয়াছেন। উভয়ের প্রভেদ উদয়ন—শ্রাবণ—পৃষ্ঠা ৩৭৮ ও অগ্রহায়ণ—পৃ ৯৬১ দ্রষ্টব্য।

২. ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথায়—'উদয়ন' শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ ৩৭৮।

৩. নাট্য—রসাশ্রয়; নৃত্য—ভাবাশ্রয়, নৃত্ত তালাশ্রয়—দশরূপক মতে ইহাই সংক্ষিপ্ত ভেদ করণ—নৃত্তক্রিয়া, গাত্র সমূহের হস্তপাদ সমাযোগ। করণে স্থিতি ও গতি এ উভয়ই নিষ্পাদ্য। স্থিতিকালে বিভিন্ন স্থান। পূর্বকায়ে পতাকাদি, আর গতিকালে—চারী, পূর্বকায়ে বিভিন্ন নৃত্যহস্ত, দৃষ্টি প্রভৃতি করণের অন্তর্ভুক্ত। দুইটি নৃত্তকরণে এক নৃত্তমাতৃকা নিষ্পাদিত হয়। দুই

তিন বা চারি মাতৃকায় একটি অঙ্গহারের উৎপত্তি। অঙ্গহার—অঙ্গগণের অক্রটিতভাবে সমুচিত স্থান প্রাপণ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে ১০৮ করণ ও ৩২ অঙ্গহারের লক্ষণ দেওয়া আছে। পূর্বরঙ্গ—রঙ্গে যাহা পূর্বে প্রযুক্ত হয় তাহারও নাম পূর্বরঙ্গ। সভাপতি, সভ্য, গায়ক, বাদক, নটী, নট প্রভৃতি পরস্পরের অনুরঞ্জন দ্বারা আনন্দলাভ করেন তাহাই রঙ্গ।

এই রঙ্গ পূর্বে প্রযুক্ত হয় বলিয়া পূর্বরঙ্গ নামে খ্যাত ইহাই ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয়ের মত। সাহিত্যদর্পণের মতে নাট্যবস্তু প্রয়োগের পূর্বে রঙ্গবিঘ্ন শান্তির জন্য কুশীলবগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন। তাহাই পূর্বরঙ্গ। অভিনবগুপ্ত সমাস ভাঙ্গিয়াছেন "পূর্ব রঙ্গে"। নাট্যশাস্ত্রের মতে পূর্বরঙ্গের উনবিংশতিটি অঙ্গ। উহার মধ্যে নয়টি যবনিকার অন্তরালে প্রযোজ্য—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপানি, পরিঘট্টণা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত। দশটি যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য। গীতক, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত, প্ররোচনা। শারদাতনয় ২২টি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণ, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘট্টনা, মার্গাসারিত, শুষ্কাপকৃষ্ট, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, প্ররোচনা, ত্রিগত, আসরিত, গীত, ধ্রুবা, ত্রিসাম, রঙ্গদ্বার, বর্দ্ধমানক, চারি, মহাচারি। মোটের উপর প্রকৃত অভিনয়ের পূর্বে নাট্যের অঙ্গভূত—গীত, তাল, বাদ্য, নৃত্ত, পাঠ্য প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমস্তভাবে যে প্রয়োগ করা হয় উহারই নাম পূর্বরঙ্গ। এই পূর্বরঙ্গ চারি প্রকার—চতুরস্র, সাস্র, চিত্র ও শুদ্ধ। মতান্তরে কোহলাদির মতে ইহা ত্রিবিধ শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র। পূর্বরঙ্গের গীতক বলিয়া যে অঙ্গটি আছে, উহা এক প্রকার গীতবিধি মাত্র। উহার বিষয় দেবতাগণের স্তুতি কীর্তন। এই গীতক যদি অঙ্গ চালন ব্যতীত প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গের প্রয়োগ হইতেছে বুঝিতে হইবে। আর উহাতে যদি নৃত্তের সংমিশ্রণ থাকে। তবে উহা হইবে চিত্র পূর্বরঙ্গ। উদ্ধত পূর্বরঙ্গে মহাদেবের আবিষ্কৃত করণাঙ্গহারের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আর সুকুমার পূর্বরঙ্গে মহাদেবীর আবিষ্কৃত অনুদ্ধত অঙ্গহার যোজনীয়। অভিনবগুপ্ত স্পষ্টভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পার্বতী যে সুকুমার প্রয়োগকর্ত্রী তাহা নাট্যশাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে (৪।২৫৭) দশরূপককার বলেন যে ভাবাশ্রয় নৃত্যে পদার্থাভিনয় বর্তমান। উহা 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ। তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম 'দেশী'। নৃত্য ও নৃত্ত উভয়ই আবার দ্বিবিধ-মধুরও উদ্ধত। মধুর প্রয়োগের নাম

'লাস্ত' ও উদ্ধতের নাম 'তাণ্ডব'। শারদাতনয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। যাহা রসাত্মক তাহাই বাক্যার্থাভিনয় প্রধান। যাহা ভাবাশ্রয় তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য ভাবাশ্রয়। নৃত্ত রসাশ্রয়। এ উভয়ই নাট্যের উপকারক।

শারদাতনয়ের মতে দৃশ্যকাব্য ত্রিশ প্রকার। তন্মধ্যে নাটকাদি দশটি রূপক রসাশ্রিত ও বাক্যার্থাভিনয় প্রধান। অবশিষ্ট ডোম্বী প্রভৃতি বিংশতি রূপক পদার্থভিনয় প্রধান। অবশ্য এই সংজ্ঞাভেদ লইয়া মতান্তর আছে। কিন্তু শারদাতনয় স্বয়ং পুর্বোক্ত মত পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নটের কর্ম নাট্য, আর নর্তককর্ম পদার্থাভিনয়। নটকর্ম ও নর্তককর্ম এ উভয়ই আবার নৃত্ত-নৃত্যভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় (নৃত্য) 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ ও তদ্রহিত (নৃত্ত) 'দেশী'। ডোম্বী' শ্রীগদিত প্রভৃতিতে পদার্থাভিনয়ের প্রাধান্য বলিয়া, ঐ বিংশতি রূপককে 'নৃত্যে'র প্রকাব ভেদ বলা হইয়াছে। এই 'নৃত্যে'র স্বরূপ—গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সমূহদ্বারা পদার্থাভিনয়। নাটকাদি রূপকসমূহে যে 'নৃত্ত, প্রযুক্ত হয় তাহার স্বরূপ—লয়তাল-সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপশূন্য যে অভিনয় তাহাই 'নাট্য'। মোটের উপর নৃত্ত নটাশ্রিত। রসপ্রধান ব্যাপার ; আর নৃত্য ভাবাভিনেয় ও নর্তকাশ্রিত। নৃত্ত ও নৃত্য—উভয়ই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দ্বিবিধ। মধুর 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' উদ্ধত। নট ও নর্তক মিলিয়া রসভাব সমাযুক্ত যে অঙ্গচালন করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত অঙ্গহার ও লয়গুলি যাহাতে ললিতভাবযুক্ত ও কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির যাহাতে প্রাধান্য—তাহাই লাস্য। আর যাহার করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত। বৃত্তি আরভটী তাহাই তাণ্ডব। পূর্বরঙ্গে এ উভয়কেই প্রয়োগ কর্তব্য। আবার অন্যত্র বলিতেছেন—নৃত্তই তাণ্ডব ও নৃত্য লাস্য। তালমান লয়যুক্ত, উদ্ধত অঙ্গহারসহ যে অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র তাহাই তাণ্ডবনৃত্ত। আর অনুদ্ধত অঙ্গহারের নাম লাস্যনৃত্য। লাস্য চতুর্বিধ—শৃঙ্খল', লতা পিণ্ডী, ভেদ্যক। তাণ্ডব ত্রিবিধ—চণ্ড, প্রচণ্ড, উচ্চণ্ড।

৪. কোন কোন স্থলে 'তাণ্ড' বা 'ভাণ্ডিন' পাঠ আছে। অভিনবগুপ্ত, বলেন যে, 'তণ্ডু' শব্দই ঠিক। 'তণ্ডু' হইতেই তাণ্ডব শব্দের ব্যুৎপত্তি অনায়াসলভ্য না: শ: ৪।২৬৭৮)।

৫. ইহা নাট্যশাস্ত্রের মত। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতিও এই মতের

অনুসরণ করিয়াছেন। গুণচন্দ্র ও রামচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণের মতে দ্বাদশরূপক— উক্ত দশ রূপক ব্যতীত নাটিকা ও প্রকরণীকেও উহা নাটক ও প্রকরণের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক সংখ্যা ধরা হয় নাই। দশরূপকেও ইহারই অনুসরণ দৃষ্ট হয়। ইহারা কেহই পৃথক উপরূপকের উল্লেখ করেন নাই। শারদাতনয় মোট ত্রিশ প্রকার রূপকের নাম করিয়াছেন। উপরূপক সংজ্ঞাটি তিনি ব্যবহার করেন নাই।

৬. অর্থ—ত্রিবর্গোপায়। ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম।

৭. প্রস্তাবনা, আমুখ—নাট্যশাস্ত্রমতে ইহা দ্বারা কাব্য প্রখ্যাপন হইয়া হইয়া থাকে। নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক রূপকের যে অংশ সূত্রধারের (অর্থাৎ তৎসদৃশ গুণ ও আকৃতিবিশিষ্ট কাব্যস্থাপকের) সহিত আলাপ করিতে থাকেন, ও নিজ কার্য্যের বর্ণনা স্থলে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা প্রস্তুত বস্তু সূচনা করিয়া দেন, তাহাই প্রস্তাবনা বা আমুখ। সন্ধি—Junctures of the plot—এক (পরম) প্রয়োজনে অন্বিত ভিন্ন ভিন্ন কথাংশের অবান্তর এক প্রয়োজন সম্বন্ধই সন্ধি। সন্ধি মোট পাঁচটি।

৮. উদাত্ত-মানবের তুলনায় দেব ও দৈত্যগণ স্বভাবতঃ ধীরোদ্ধত হইলেও, স্বজাতিমধ্যে যাঁহারা ধীরোদাত্ত তাঁহারাই নায়ক হইবার যোগ্য, দ্বাদশ—তিন অঙ্কে দ্বাদশ নায়ক; অতএব, প্রতি অঙ্কে চারজন নায়ক। তন্মধ্যে একজন মুখ্য নায়ক, একজন প্রতিনায়ক, আর দুইজন সহ নায়ক—প্রতিনায়কের সহায়।

৯. নাড়ী, নাড়িকা, নালিকা—ইহার পরিমাণ লইয়া বহু মতভেদ আছে। নাট্যশাস্ত্রে একস্থানে পাওয়া যায়,—নাড়িকা=মুহূর্ত (২০।৬৮); আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, নাড়িকা=অর্দ্ধ মুহূর্ত (২০।৭২) দশরূপকমতে—নাড়িকা=দুই ঘটিকা। সাহিত্যদর্পণেরও সেই মত। নাট্যদর্পণের মতে মুহূর্ত=দুই ঘটিকা। ইহাতে নাড়িকা শব্দের উল্লেখ নাই। তবে প্রথমায় ছয় মুহূর্ত, দ্বিতীয় দুই মুহূর্ত ও তৃতীয় অঙ্ক এক মুহূর্ত পরিমিত করায় উপদেশ আছে। ইহাতে বোধহয়, নাড়িকা=ঘটিকা=অর্দ্ধ মুহূর্ত। শারদাতনয়ের মতে নাড়িকা —এক মুহূর্তের চতুর্থাংশ—"মুহূর্তস্য তুরীয়াংশো নাড়িকা ঘটিকাদ্বয়ম" (পৃ: ২৪৯) প্রতাপরুদ্রের মতে—অঙ্কত্রয় যথাক্রমে তিনযাম, একযাম ও অর্দ্ধযাম পরিমিত। এ সকল বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য। সাধারণ হিসাবে—একযাম=এক প্রহর=তিনঘণ্টা=সাড়ে সাত দণ্ড। এক মুহূর্ত=২৮ মিনিট। এক দণ্ড=এক ঘটিকা=চব্বিশ মিনিট। এক নাড়িকা (যদি মুহূর্তার্দ্ধ হয়)=চৌদ্দ মিনিট।

১০ রস—শৃঙ্গার, হাস্য করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, (মতান্তরে) শান্ত ও বৎসল। প্রহসন শব্দটি এ-স্থলে স্বনাম প্রসিদ্ধ রূপককে বুঝাইতেছে না। ইহার অর্থ—হাস্যোদ্রেককর ঘটনা। বীথী—একাঙ্ক রূপক। পাত্র একটি অথবা দুইটি। নায়ক উত্তম, মধ্যম বা অধম প্রকৃতি বিশিষ্ট। মুখ-নির্বহন সন্ধি শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য কিন্তু অপর সকল রসই থাকিবে। পাঁচটি অর্থ প্রকৃতিই ইহাতে থাকা উচিত। ইহার নৃত্যগীত বহুল ত্রয়োদশটি অঙ্গ—উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, অবস্যন্দিত বা অবস্পান্দিত, অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, কাকেলি, অধিবল, ছল, ব্যাহার, মৃদব, ত্রিগত ও গণ্ড। অর্থপ্রকৃতি—প্রয়োজন সিদ্ধিহেতু। সংখ্যায় পাঁচটি—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, ও কার্য্য। বিন্দু কাব্য সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যদি অবান্তর বিষয়ের (digression) দ্বারা প্রয়োজনের বিচ্ছেদ হয়, তবে বিন্দুই পুনরায় উহার অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করেন। প্রবেশক—একপ্রকার অর্থোপক্ষেপক। অর্থোপক্ষেপক পাঁচটি—বিষ্কম্ভ, প্রবেশক চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ। বিষ্কম্ভ—অতীত ও ভবিষ্যৎ কর্মাংশের সংযোজক ও রূপকের অংশবিশেষ। নীরস অথচ সপ্রয়োজন ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রথমাঙ্কের আদিতে অথবা অঙ্কদ্বয় মধ্যে উপন্যস্ত হইয়া থাকে। একটি মধ্যমপাত্রদ্বয় কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে ইহা শুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়, আর নীচ ও মধ্যম পাত্রদ্বারা প্রযুক্ত হইলে সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা লাভ করে। প্রবেশক—interlude ইহাও অনেকটা বিষ্কম্ভকের মত। কেবল অঙ্কের আদিতে প্রযোজ্য নহে। অঙ্কদ্বয় মধ্যে ইহার নিবেশ কর্তব্য। কেবল নীচপাত্রদ্বারাই ইহা প্রযুক্ত হয়। অতএব, প্রাকৃত ভাষাতেই প্রবেশক নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

১১ যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্র কর্তৃক বিষয়ের সূচনার নাম চূলিকা। যে স্থলে রঙ্গমঞ্চে কেহ উপস্থিত থাকে না। কেবল নেপথ্যস্থিত পাত্রের দ্বারা, অভিনেয় বিষয়ের সূচনা করা হয়; তাহারই নাম চূলিকা (চূড়া)। ইহা অভিনেয় অর্থের শিখাস্থানীয়। একটি অঙ্কের শেষে সেই অঙ্কের কথাবিচ্ছেদ না করিয়া যদি নূতন অঙ্ক আরম্ভ করা যায়, তবে তাহাকে অঙ্কাবতার বলে। সমাপ্ত অঙ্ক ও আরম্ভনীয় অঙ্কের মধ্যে বিষয়গত ব্যবধান থাকিলেই বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের দ্বারা অঙ্কদ্বয়ের সংযোগ করা প্রয়োজন হয়। অঙ্কাবতারে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের দ্বারা অর্থসূচনার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে পূর্বাঙ্কের পাত্রগুলি দ্বারাই পরবর্তী অঙ্কের প্রারম্ভ হইয়া থাকে। তাহা

ছাড়া পূর্বাঙ্কের অবসানোক্ত কথাংশ ও পরবর্তী অঙ্কের প্রারম্ভস্থিত কথাংশ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। (মতান্তরে) যে অঙ্কে অন্ত অঙ্কের বীজভূত অর্থের অবতারণা করা হয় তাহাই অঙ্কাবতার। অঙ্কের বিশিষ্ট মুখ পূর্ব হইতেই যথায় সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তাহাই অঙ্কমুখ। ইহা নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণ। সাহিত্যদর্পণের মতে—যদি একটি অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে নানা অঙ্কের ও ভাবী ভূমিকাগুলির সূচনা করা হয়। তবে তাহাই বীজার্থব্যাপক অঙ্কমুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দশরূপকাদিতে অঙ্কাস্য নামে একটি অর্থোপক্ষেপকের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বাঙ্কের অন্তে-পাত্র প্রবেশ করায় কথাবিচ্ছেদ হইলে যদি উত্তরাঙ্কের সূচনা ঐ নবপ্রবিষ্ট পাত্রের দ্বারা করা হয়। তাহা হইলে অঙ্কাস্য প্রয়োগও হইয়া থাকে।

১২ বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে, 'উদয়ন'—শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ ৩৭৭ ও অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৯৬০-৯৬১ দ্রষ্টব্য।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

[এই প্রবন্ধটি প্রথমে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প', আষাঢ় ১৩৩৬ সালে এবং পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' ভাদ্র ১৩৩৬ সালে 'কষ্টি পাথরে' কিঞ্চিত সংক্ষিপ্ত আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়।]

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ছাপা হইয়াছে। ইংরেজি ১৮৯৪ সালে কাব্যমালায় ছাপা হইয়াছে। আর ১৯২৬ সালে গায়কোয়াড ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহা চার খণ্ডে পুরা হইবে। একখণ্ড মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার সহিত অভিনবগুপ্তের টীকা আছে। চৌখাম্বা হইতেও ইহার আর এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কাব্যমালার সংস্করণের সম্পাদক দুইখানি মাত্র পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাতে অনেক পাঠ ছিল না; অনেক জায়গায় পোকায় খাওয়া ছিল। সে সকল বাদ দিয়া তাঁহাকে ছাপাইতে হইয়াছে। গাইকোয়াডের বই পুথি দেখিয়া ছাপা হইতেছে। তাহার সঙ্গে টীকার পাঠও আছে। চৌখাম্বায় মূল মাত্র, কিন্তু সে মূল কাব্যমালার মূল অপেক্ষা অনেক ভাল।

নেপালের একখানি হাতের লেখা পুঁথির সহিত কাব্যমালার পাঠ মিলাইতে

গিয়া দেখি প্রায় ১০ অংশের এক অংশ নাই ; গাইকোয়াড়ের নাট্যশাস্ত্র বাহির হওয়ায় বুঝিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। পাঠের সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। টীকাও ভাল। কিন্তু টীকা অভিনবগুপ্তের লেখা, বড় গাঢ়। কিন্তু সে তো ৭ অধ্যায় বই বাহির হয় নাই। বাহির হইবার জন্ম লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। তাহার উপর আবার রামচন্দ্র কবি সম্পাদক লিখিয়াছেন, শেষ ভাগ যখন বাহির হইবে তখন ইংরেজিতে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা লিখিবেন…কিন্তু তাহার বই বাহির হইতে এখনও বোধ হয় আট বছর লাগিবে। এই আট বছরের জন্ম পাঠকদিগের কতকটা তৃপ্তি যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্রে আমি আজ ভরত নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলিব।

ম্যাক্সমূলর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন বেদের পুঁথিগুলি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ছান্দস, দ্বিতীয় মন্ত্র, তৃতীয় ব্রাহ্মণ, চতুর্থ সূত্র। এ চারি শ্রেণীরই লিখিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র, রীতি স্বতন্ত্র, বিষয় স্বতন্ত্র, আরম্ভ স্বতন্ত্র, শেষ স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে শেষ শ্রেণী সূত্র। বেদের সূত্রগুলি গদ্যে লেখা। আমাদের এখনকার সূত্রের মতন অত ঠাস গাঁথুনি নয়…লেখা সোজাসুজি সংস্কৃতে যাহাকে প্রাঞ্জল বলে তাই।

ম্যাক্সমূলর বলেন যে, সূত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে পর ব্রাহ্মণেরা শ্লোকচ্ছন্দে লম্বা লম্বা পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ভাষা বেদের ভাষা হইতে অনেক স্বতন্ত্র, সহজ এবং পাণিনি সম্মত। আমি আরও দেখিতে পাই যে, এই সকল লম্বা লম্বা শ্লোক ছন্দের পুঁথি প্রায়ই একজন মুনি বলিতেছেন আর অন্ত মুনিরা শুনিতেছেন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই জিজ্ঞাসা ও উত্তরের নাম সংবাদ। ষট্ সংবাদ না হইলে তাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করা যায় না…ভরতনাট্যশাস্ত্র কিন্তু এরূপ ষট-সংবাদ নয়। ইহাতে একই সংবাদ। ভরত মুনি বলিতেছেন এবং অন্ত ঋষিরা শুনিতেছেন, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। কাহারও নাম নাই। ইহাতে নাটকের উৎপত্তির কথা আছে। কেমন করিয়া থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ারী করিতে হয় তাহার কথা আছে। ইহাতে থিয়েটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্ম থাকিত। ইহাতে দোতলা ষ্টেজের কথা আছে। ইহার সিনগুলা নাড়াচাড়া করা যাইত না। নিচের চারি পাশে ঢাকা থাকিত। পাশ দিয়া পাত্র প্রবেশ হইত না। ভিতর দিক হইতে দু-পাশে দুটি দরজা থাকিত। তাহাতে পরদা দেওয়া থাকিত। সেই পর্দা সরাইয়া পাত্র প্রবেশ করিত। ষ্টেজের উপর নাটক আরম্ভ হইবার পূর্বে অনেক

জিনিস করিতে হইত। সেগুলিকে পূর্বরঙ্গ বলিত। পূর্বরঙ্গে সূত্রধার আসিয়া প্রথমেই জর্জরের পূজা করিত।

জর্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব থাকিত। প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রং থাকিত। এক এক পাবের জন্য এক এক দেবতা থাকিত। এই জর্জর হইলেন থিয়েটারের দেবতা। সূত্রধার জর্জরের পূজা করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তারপর সূত্রধার ষ্টেজের উপর নানা ভঙ্গীতে পায়চারি করিতেন, তাহার নাম "চারি" আর "মহাচারি" তারপর নান্দীপাঠ।

সূত্রধার স্বস্বরে নান্দীপাঠ করিতেন। নান্দীতে ৮টি কি ১২টি বাক্য থাকিত। অথবা ১২টি চরণ থাকিত। এক একটি বাক্য পড়া হইলে পাশে দুজন লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা বলিত "এই হউক"। নান্দীতে দেবতাদের স্তুতি থাকিত। ব্রাহ্মণদের স্তুতি থাকিত। রাজারও স্তুতি থাকিত। দেশের লোকের মঙ্গলকামনা করা হইত, থিয়েটারের মঙ্গল কামনা করা হইত। তাহাতে কেবল মঙ্গলের কথাই থাকিত, অমঙ্গলের কথা কিছু থাকিত না। নান্দীপাঠের পর পাত্র প্রবেশ। এখন যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইত। কিন্তু সূত্রধার পাত্র প্রবেশ করাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িত। মধ্যে, অর্থাৎ নান্দীর পর, এবং পাত্র প্রবেশের মধ্যে সূত্রধার প্রেক্ষকদিগের বেশ একটু খোসামোদ করিতেন। কবির গুণের কথা বলিয়া দিতেন এবং দু-একটা গান গাহিতেন।

থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। নাচের তিন অঙ্গ। প্রথম অঙ্গহার, দ্বিতীয় করণ, তৃতীয় নাট্য। ললিত অঙ্গভঙ্গীর নাম অঙ্গহার। দুই তিন অঙ্গভঙ্গী একসঙ্গে করিলে তাহার নাম হইত করণ। অনেকগুলি করণ একত্র হইলে নৃত্য হইত।

থিয়েটারের এই বইয়ে কিরূপ পাত্রকে রাজা করিতে হইবে, রাণী করিতে হইবে, বিদূষক করিতে হইবে, চাকর করিতে হইবে। তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ দেওয়া আছে। তারপর রং করার কথা আছে। শক, যবন, পারদদের সাদা রং দিতে হবে। দ্রাবিড় অন্ধ্র দেশের লোকদের কালো রং দিতে হইত। বাঙ্গালীদের রং অত কালো হইত না। কাশ্মিরী রং দুধে-আলতার মত হইত। সারা দেশের লোকের নানারকম রং করিতে হইত। মূল রং তো চারিটা কি পাঁচটা, সেইগুলি মিশাইয়া ২০।২৫ রকম রং তৈয়ারি করিত এবং তাই ফলাইত।

নাটকের প্রকৃতি বলিয়া একটা জিনিস ছিল। কোন দেশের লোক নাটকের নাচ দেখিতে ভাল বাসিত। কোন দেশের লোক গান শুনিতে ভালবাসিত। কোন দেশের লোক অভিনয় ভালবাসিত। কোন দেশের লোক বক্তৃতাকেই ভাল বলিত। বৃত্তি বলিয়া নাটকের আর একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গী। কোথায় লম্বা সমাস করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে না, কেহ সোজা কথায় লিখিত, কেহ বাঁকা কথায় লিখিত, কেহ শক্ত কথায় লিখিত, কেহ দুরূহ কথায় লিখিত। ছন্দের উপর ভরতের খুব দৃষ্টি ছিল। তিনি পিঙ্গলের ছন্দগুলি অনেক ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের সব শেষ অধ্যায়ে আছে সিদ্ধির কথা ও ঘাতের কথা। ঘাত মানে যাহাতে রসভঙ্গ হয়। আর সিদ্ধি মানে যাহাতে রস জন্মে। ঘাত—যেমন অভিনয় করিতে আসিয়া রাজার মুকুটটা খসিয়া গেল। কোন নট যাহা বলা উচিত তাহার উল্টা কথা বলিল। থিয়েটার হইতেছে এমন সময় পিঁপড়ের পাল উড়িল অথবা সবুজে পোকা আসিয়া পড়িল। তাহাও ঘাত, অথবা চোর ডাকাত আসিয়া পড়িল। আর সিদ্ধি যখন রস জমিয়া উঠে। করুণ রসে হা হুতাশ করে অথবা হাস্যরসে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। দেবতার আশীর্বাদ হইলে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া উঠে। সিদ্ধির পরই নাট্যশাস্ত্র একরকম শেষ হইয়া গেল। এইটাই ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়। ২৮ হইতে বাজনার কথা আরম্ভ হইল। বাজনা কয় রকম, কোন রসে কোন্ বাজনা ভাল লাগিবে, কোন সময়ে কোন বাজনা লাগাইতে হইবে।—তার গানের কথা, সুরের কথা। পুরা দস্তর সঙ্গীত শাস্ত্রের কথা। ৩৬ ও ৩৭ অধ্যায়ে নাট্যশাস্ত্রের নট ও নটীদের, উৎপত্তি ও বিবরণ নাট্যশাস্ত্রের একটু ইতিহাস এবং শেষ ফলশ্রুতি।

এই যে লম্বা শ্লোক ছন্দের বই ইহার ভিতরে আর দুখানি বই আছে। সে দুখানি লম্বাও নয়, শ্লোক ছন্দে লেখাও নয়। সে দুখানি পুরাদস্তুর সূত্র-শ্রেণীর পুঁথি বা তাহার কোন অংশ। প্রথমখানি নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে, ২য় খানি ২৮, ২৯, ৩০ অধ্যায়ে। একখানি রসের ব্যাখ্যা, আর এক খানি গানের ব্যাখ্যা। রসের ব্যাখ্যায় যে সূত্রগুলি আছে, তাহা কিন্তু নটসূত্রের অন্তর্গত। কেন না, তাহার প্রত্যেক কথাতেই কি রূপ করিয়া সেই রস বা ভাব অভিনয় করিতে হইবে তাবার সূক্ষ্ম উপদেশ দেওয়া আছে। দ্বিতীয় খানি সঙ্গীত সূত্র। এখানি নট-সূত্রের অন্তর্গত কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। এখানি সূত্র লিখিবার কালের পুঁথি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।…ভরত

মুনিকে ঋষিরা পাঁচটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই পাঁচটি প্রশ্ন এই—যারা নাট্যশাস্ত্রের সমঝদার তারা রস বলিয়া একটা কথা কয়, রস কাহাকে বলে এবং কি হইলে রস হয়; ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবাইয়া দেয়; সংগ্রহ কাহাকে বলে। কারিকা কাহাকে বলে, নিরুক্ত কাহাকে বলে। এই পাঁচটি কথা শুনিয়া ভরতমুনি তাহাদের উত্তর দিলেন। সে উত্তরটি পাঁচ-এর শ্লোক হইতে ৩২-এর শ্লোক পর্যন্ত। তাহার পরই নটসূত্রের মধ্যে রসসূত্র আরম্ভ······

সূত্র এবং ভাষ্যে যে সকল জিনিস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা আছে সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলার নাম 'সংগ্রহ'। রস, ভাব, অভিনয়, পাত্র, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাজনা, গান—এই হইল রসের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশাস্ত্রে আছে।

কারিকা কাহাকে বলে? সূত্রে এবং ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া লেখা আছে, সেই জিনিস ছোট করিয়া একটি বা দুইটি শ্লোকে বলার নাম কারিকা। এইখানে বলিয়া রাখি রসসূত্রে দুইরকম কারিকা আছে। কতকগুলি শ্লোক ছন্দে, কতকগুলি আর্যাছন্দে। কিন্তু এইগুলি একজনের লেখাও নয়। কারণ. অনেকস্থলে কারিকাগুলিতে আর্য্যাছন্দের কারিকাও তোলা হইয়াছে এবং শ্লোক ছন্দের কারিকাও একত্রে তোলা হইয়াছে।

নিরুক্ত কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ সাধন হয় তাহার নাম ব্যুৎপত্তি, তাহারই নাম নিরুক্তি। কিন্তু এখানে নিরুক্ত বলিতে আরও একটু বেশী বুঝায়। ইহাতে কতকটা ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকটা সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকটা অন্য অন্য প্রমাণ দেওয়াও বুঝায়।

এইরূপে সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত এই সম্বন্ধীয় তিনটি জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া ভরতমুনি সংগ্রহটা আর একটু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। রস কতগুলি, তাহাদের নাম করিয়াছেন, ভাবের ভিতর স্থায়ী কতগুলি, ব্যভিচারী কতগুলি, সাত্ত্বিক কতগুলি, অভিনয় ক'রকম, পাত্র ক'রকম, বৃত্তি ক'রকম, প্রবৃত্তি ক'রকম, সিদ্ধি ক'রকম, স্বর কত, বাজনা কত রকম, কেমন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে হয়, যাইতে হয়, থাকিতে হয়, তাহার কথা কিছু আছে, তাহার পর গান, এই সঙ্গে থিয়েটার-ঘর ক'রকম—সংগ্রহের মধ্যে এই সব কথা বলিয়া ভরতমুনি বলিতেছেন, "অতঃপরম্ প্রবক্ষ্যামি সূত্র গ্রন্থ-বিকল্পনম্—" ইহার পর আমি সূত্র ও গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিব। এই গ্রন্থ শব্দের অর্থ অভিনবগুপ্ত ভাষ্যে

লিখিয়াছেন। অর্থ এই হইল যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩২টি শ্লোকের পর ভরতমুনি সূত্র ও ভাষ্য মিলাইয়া এবং তাহার সহিত নিরুক্ত ও কারিকা দিয়া একখানি সূত্র গ্রন্থ এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন।

বৈদিক সূত্রে শুধু সূত্রগুলি থাকিত। বেদের মত সে সূত্রগুলিও ব্রাহ্মণে মুখস্থ করিয়া লইত। ব্যাখ্যা মুখে মুখেই থাকিত। ব্যাখ্যাটা চলিত সংস্কৃতে ছিল। চলিত সংস্কৃতের নাম ছিল ভাষ্য। সেইজন্যে সূত্রকে ভাষায় ব্যাখ্যা করার নাম ভাষ্য। কৌটিল্য সূত্রের সঙ্গে ভাষ্য যোগ করিয়া এক রকম নূতন প্রণালীর আবির্ভাব করেন। তিনি যদিও বলেন যে, সূত্র ও ভাষ্য এক করিয়া দিতেছি, তথাপি তিনি মাঝে মাঝে নিরুক্তও দেন এবং কারিকাও দেন। সেই রূপ এই যে সূত্রগ্রন্থ ইহাতেও সূত্রভাষ্য ছাড়া অনেক জায়গায় নিরুক্ত এবং সব জায়গায় কারিকা দেওয়া আছে। ৩২টি শ্লোকটি বলিয়া ভরতমুনি গদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। গদ্যের প্রথম কথা এই—"রসানে ভাবম্ আদৌ অভিব্যাখ্যাসামঃ নহি রসামৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্তত ইতি—"

এই যে সূত্র গ্রন্থের এক অংশ ভরত নাট্যশাস্ত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেই কয়েকটা কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। আমার বিশ্বাস এটি কোন নটসূত্রের অংশ। কারণ ইহার প্রত্যেক স্থলেই রসের, প্রত্যেক স্থায়ীভাবের, প্রত্যেক ব্যভিচারিভাবের, প্রত্যেক সাত্ত্বিকভাবের, নট কি করিয়া সেই রস ও ভাব প্রকাশ করিবে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া আছে। অনেক জায়গায়ই "অভিনেতব্য" "অভিনয় কর্ত্তব্যঃ" "অভিনয়েৎ" এইরূপ কথা আছে। সুতরাং এই রসভাবের বর্ণনা দার্শনিকভাবে হয় নাই। থিয়েটারের অনুরূপ করিয়াই করা হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। বড়লোকের হাসি কি করিয়া অভিনয় করিবে? একটু মুখ মুচকাইয়া হাসিবে। এমন কি তাহাদের দাঁতও দেখা যাইবে না। রাণী, সখী, মন্ত্রী ইত্যাদি ইহাদের হাসি দেখাইতে গেলে দাঁত বাহির কিন্তু শব্দ বাহির হইবে না। কিন্তু ছোটলোকের হাসি দেখাইতে গেলে হাঁ করিয়া উচ্চ শব্দ করিতে হইবে। আমি তো সংক্ষেপে বলিতেছি। কিন্তু পুঁথিতে ঢের বেশী আছে। এইসব রসে সব ভাবের ইঙ্গিত করা সহজ কথা নয়। কিন্তু নটসূত্রের এ অংশে সেটি করা হইয়াছে। যতদূর সাধ্য ভাল করিয়াই করা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে নটসূত্র কাহাকে বলে। পাণিনী আপনার সূত্রে দুই-খানি নটসূত্রের নাম করিয়াছেন। দুইখানিই কবি "প্রোক্ত" অর্থাৎ কাহারও-

রচিত নয়, কৃত নয়। "প্রোক্ত" গ্রন্থের কথা কহিয়া তাহার পর পানিনি "কৃত" গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোন কবি সেগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "প্রোক্ত"। আর নিজের মাথা থেকে রচনা করা হইয়াছে যাহা, তাহার নাম "কৃত"। পানিনি যে দুখানি নটসূত্রের কথা বলিয়াছেন দুখানিই "প্রোক্ত"। অর্থাৎ ঐ সকল কথা অনেক দিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। ঋষিরা সেইগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া আসিয়াছে। আমরা আর একখানি নটসূত্র ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কারণ, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীর দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়াছেন ভরতমুনি একজন নটসূত্রকার। তিনি স্বর্গে লক্ষ্মী স্বয়ংবর নামে এক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং নিজে তাহার অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। উর্বশী সেই নাটক অভিনয় করিতে গিয়া "ঘাত" করিয়া ফেলেন—"নারায়ণ বলিতে গিয়া 'পুরুরবা' বলেন। তাই ভরতমুনি শাপ দেন, তুমি পৃথিবীতে গিয়া থাক। সুতরাং ভরতের একখানি নটসূত্র ছিল। সেখানির কথা ভবভূতি উত্তররামচরিতের ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়া গিয়াছেন। সেখানির নাম "তৌর্য্যত্রিক সূত্র" অর্থাৎ বাজনার সূত্র।

ভরত-নাট্যশাস্ত্রে যে দুইখানি সূত্র আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা বোধ হয় এই ভরতের লিখিত নটসূত্র ও তৌর্য্যত্রিক-সূত্র। একখানিতে নটদের শেখান হইতেছে। আর একজন নবীন লেখক বলিয়াছেন, পানিনির ব্যাকরণে দুইটি নটসূত্রের নাম আছে। কিন্তু তাহাতে কি আছে না আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আমাদের এমনই মন্দভাগ্য যে, ঐ নট-শব্দ আর সূত্রশব্দ আছে উহা হইতেই আমরা ইতিহাস অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। নট বলিতে একটা পেশা বুঝায়। একটা পেশা থাকিলেই নাটক যে তখন অনেক ছিল একথা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে একথা আমরা বলিতে পারি যে, পানিনির অনেক পূর্ব্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহু সংখ্যক নাটক লেখা হইয়াছিল। আরও কথা আছে। যখন পানিনির ঐ সূত্রেই নটসূত্র বলিয়া সমাস করা আছে। তখন এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পেশাদার লোকদের শিক্ষা দিবার জন্য তখন সূত্রগ্রন্থ লেখা হইয়া গিয়াছিল এবং "প্রোক্ত" হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টাগুলিতে একত্র করিয়া শিলালী ও কৃশাশ্ব সূত্র-গ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, নাটক আমরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম একথার মূল্য কি? পানিনি তো খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বৎসরের এধারে আসিতে পারেন না। সূত্রগ্রন্থ তাহারা অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্বে প্রোক্ত হইয়াছিল। দুজন প্রোক্ত করিয়াছেন। সুতরাং দুজনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাঁহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরানো কথা লিখিয়াছিলেন। তাহার আগেও নাটক ছিল। কেননা নট বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে। তখন আমাদের নাটকের আদি কোথায়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

তাণ্ডব

তাণ্ডব শব্দটা আমরা তেমন সদর্থে ব্যবহার করিনা। যেখানেই একটা গোলমেলে ব্যাপার অথবা হৈহুল্লোড় ঘটে সেখানেই আমরা মন্তব্য করি—লোকগুলো একটা তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে। তাণ্ডব যেন ডিসিপ্লিনের সম্পূর্ণ উলটো একটা ভয়াবহ কার্যকলাপ, যেখানে কেবল অসংযত উন্মত্ত দেহভঙ্গী আমাদের যুগপৎ ভীতি ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। অথচ—এই নাচটিকেই দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ক্রুদ্ধ শঙ্করের সংহারমূর্তিতে যে উল্লম্ফন, প্রলম্ফন সেটাই হচ্ছে তাণ্ডব, এমনি একটা ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কাব্যে, সাহিত্যে, লৌকিক পুরাণে—এরই উল্লেখ, এমনকি বর্ণনাও আমাদের চোখে পড়ে।

অথচ, এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন আমাদের মনে এ যাবৎ জেগেছে বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে তাণ্ডব নিয়ে তেমন গুরুতর আলোচনা কদাচিৎ প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এমনকি, সংস্কৃত পুরাণাদিতে শিবের নৃত্য সম্বন্ধে স্থানে স্থানে উল্লেখ থাকলেও তাণ্ডব শব্দটি কদাচিৎ দেখা যায়। জনশ্রুতিই এই শব্দটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে এবং একটা লৌকিক ধারণা গঠন করতে সাহায্য করেছে।

প্রথমেই যে কথাটা মনে জাগে সেটা হচ্ছে এই যে, এই নৃত্য যদি সম্পূর্ণভাবে শিবের আচরিত হয়ে থাকে তাহলে তার আখ্যা "তাণ্ডব" হল কেন? তাণ্ডবের সঙ্গে মহাদেবের সম্পর্কটা তাহলে কোথায়? শিবের এতগুলি নামের কোনও একটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়েও তো এই নৃত্যের পরিচয় হতে

পারত, কিন্তু তা হয়নি কেন? স্বভাবতই মনে সন্দেহ জাগে, এই নৃত্য পুরোপুরি শিবের কৃতিত্বে সম্পাদিত হয়নি, অন্য কারুর হাত এই রচনায় অবশ্যই ছিল। যদিচ অমরকোষ এই শব্দের একটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—ভূমিতে তাড়না দ্বারা এই নৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল বলেই এর আখ্যা তাণ্ডব; তথাপি সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন যে, "তণ্ডুনা মুনিনা প্রোক্তম্" (তণ্ডু মুনিদ্বারা উপদিষ্ট) বলেই একে ওই আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি যে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আমাদের সর্ববিধ সংশয়ের নিরসন করেছেন। কিন্তু, এই নৃত্য সম্পর্কে শিবের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। আসলে, তাঁরই প্রবর্তিত নৃত্যের পরিশীলন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ফলেই যে নৃত্যধারার প্রবর্তন হয়েছিল, তাই হচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য। অতএব, শিবই হচ্ছেন এর নায়ক এবং প্রধান নির্বাহক। কিন্তু, "তণ্ডু" নামক ব্যক্তিটিরও একটি বড় ভূমিকা আছে; কেননা—শুধু শিবপ্রবর্তিত নৃত্যের শোধনই নয়, তাকে গানের সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত করেছিলেন তিনি। অতএব, নাট্যশাস্ত্রের কাহিনী অনুসারে একে একটি যুগ্মপ্রয়াস বললেই বোধহয় সত্যভাষণ হয়। কিন্তু গ্রন্থ অনুসারে দেখা যাচ্ছে শঙ্কর নিজেই এই নৃত্যকে তণ্ডুর নামাঙ্কিত করে বলেছেন—"তাণ্ডব"। এটার পিছনে কোনও রহস্য থাকলে সেটাও বিচার্য বিষয়। এই সব প্রসঙ্গে আলোচনায় আসছি পরে, কেননা তার আগে আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন।

শিব যে জাতির নায়ক ছিলেন সেই জাতির বৈদিক নাম—রুদ্র। রুদ্রেরা ঠিক আর্য ছিলেন না এবং বেদ তাঁদের দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এঁরা ছিলেন দেবজন; অর্থাৎ যে সব জাতি দেবতা বা আর্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মরুৎ, গণ প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী এই রুদ্র-জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁরা তেমন একটা দীর্ঘদেহী ছিলেন না, কিন্তু দেখতে সুশ্রীছিলেন। এঁদের মাথায় থাকত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, সেগুলি ছিল স্বর্ণাভ। এঁদের অনেকেই বল্কলবাস ধারণ করতেন, আবার চর্মবাসও এঁদের প্রিয় ছিল। স্বভাবতঃ শান্ত এবং কৃষিনির্ভর হলেও এঁরা যুদ্ধবিদ্যা খুব ভাল জানতেন; অশ্বারোহণেও এঁদের দক্ষতা ছিল। এঁরা একরকম বিশেষ ধনু ব্যবহার করতেন, যাকে বলা হত পিনাক। এঁরা যাঁদের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী-রূপে নিয়োগ করতেন, তাঁরা "গণ" নামে পরিচিত ছিলেন।

নৃত্য ছিল এঁদের একটি বিশেষ অবসরবিনোদন। নানারকমের নৃত্য চর্চা করতেন এঁরা, যেগুলির মধ্যে যৌথ এবং একক নৃত্য—উভয়েরই প্রচলন ছিল। এঁদের এক ধরণের নৃত্য ছিল, যাকে ইংরেজিতে বলে "ম্যাকেবার ড্যান্স"। মৃত্যু বা দমন প্রসঙ্গে এই নৃত্য ভয়াবহরূপে অনুষ্ঠিত হত। তিব্বতে এখনো (অবশ্য চীন অধিকারের পর কতটা আছে বলা যায় না) এই নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। এটি বর্তমানে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। "নালজরপা" নামক তথাকথিত অলৌকিক শক্তির অধিকারী সাধক সাধনার একটা পর্যায়ে এককভাবে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করে থাকেন শ্মশানে, টাটকা মৃতদেহের সম্মুখে। তিব্বতে মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে কেটে পাখিদের বা জীবজন্তুদের আহারের জন্য ফেলে দেবার রীতি আছে। নির্জন রাত্রিতে যখন ধারে কাছে কোনও লোক সমাগম থাকে না, তখনই অনুষ্ঠিত হয় এই নৃত্য। একমাত্র উপস্থিত নর্তকের কাছে থাকে নরদেহের উরুর্ অস্থি থেকে তৈরি একরকম জোরালো তূরীজাতীয় বাঁশি (ট্রামপেট), ঘণ্টা, ফুরবা (কাঠের ছোরা, বৈদিক অভিচারক্রিয়ার পরিভাষায় "স্ফ্য") এবং ডমরু। এই ডমরু বা দমরু (তিব্বতী থেনে-ডাম?) বাদ্যটিও বোধ করি এই দিকেরই পরিকল্পনা, কেননা প্রাচীন তিব্বতে এর বিশেষ ব্যবহার ছিল এবং এই নামটিও আর্যভাষীদের নিজস্ব নয় বলে মনে হয়। এই নাচ শেখবার জন্য অভিজ্ঞ গুরুর কাছে রীতিমত মহড়া দিতে হয়। এর বিবিধরকম প্রণালী আছে। এই নৃত্যের মূলকথা হচ্ছে—এঁরা নিজেকে প্রেতযোনিদের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন; তাঁরা সম্মোহিত হয়ে দেখতে থাকেন যে তাঁদের দেহের রক্তমাংসে প্রেতগণ পরিতৃপ্ত হচ্ছেন এবং ক্রমে তাঁদের দেহ বলতে আর কিছুই থাকছে না। যখন তাঁদের সব ফুরিয়ে যায়, একটা চেতনামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁরা উপলব্ধি করেন যে দেহের সঙ্গে সমস্ত পাপ থেকেও তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন। সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই নৃত্য-ক্রিয়ার পর সকালে ফিরে আসবার সময় তাঁরা বোধ করেন যে তাঁরা একটা একটা পবিত্র দেহ নিয়ে নবজন্মলাভ করেছেন। এই যে ক্রমে ক্রমে প্রেত-যোনিদের ডেকে তাদের কাছে সমস্ত দেহকে সঁপে দেওয়া এবং সমস্ত শারীরিক বৃত্তি বা পাপবোধকে পদদলিত করা—এই সমস্তকেই একটা শিক্ষিত নৃত্যে এঁরা ফুটিয়ে তোলেন। এই নৃত্যের একটি রোমাঞ্চকর বর্ণনা প্রদান করেছেন শ্রীমতী আলেকজেন্ড্রা ডেভিডনীল তাঁর "টিবেট এণ্ড লামাজ" নামক গ্রন্থে। এই নৃত্যকে বলে "ছোদ"। "ছো" শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্ম, যার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সমস্ত

আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মঠ সম্পর্কিত লামাদের ধর্মানুষ্ঠান-সমূহও এই শব্দে সূচিত হয়। লামারা মুখোশ পরে যে ধর্মপ্রবণ ও ধর্মদ্বেষীদের নিয়ে বিরাট নৃত্যানুষ্ঠান করেন, তাকে বলা হয় "ছাম"। এই নৃত্য সম্বন্ধে লামারা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বহু বৎসর ধরে শিক্ষা করেন। এটি এঁদের জাতীয় নৃত্যানুষ্ঠান, যা শ্রেষ্ঠ অভিজাত থেকে অতি সাধারণ ব্যক্তিরাও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এক এক সময় মনে হয়, তিব্বতীদের এই সব "ছো" সম্পর্কিত নৃত্য থেকেই ভারতে ছো-নৃত্য বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুখোশ রচনায় তিব্বতীদের পারদর্শিতা অসাধারণ এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যযুক্ত মুখোশ নৃত্যও তাঁদের কাছে অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় অনুষ্ঠান। "ছো"—শব্দটিই তিব্বতীয় এবং পৌরাণিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতীক। এই ধরণের নৃত্যের মূলে আছে সুপ্রাচীন "বন"—ধর্মীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব, যার সঙ্গে "শামা"—ধর্মীদের (ইংরেজি-শামানিজম) প্রভাবও প্রবলভাবে যুক্ত হয়েছে। অবশ্য এটি এই লেখকের অনুমান মাত্র, বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে অন্য অভিমত থাকতে পারে। বর্তমানে একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক ক্রিয়াবিশেষ হলেও আদিতে এটি একটি হননবিলাস নৃত্য ছিল বলেই মনে হয়।

এই যে মৃত্যুসম্পর্কীয় নৃত্যের উল্লেখ করা হল, এর কারণ এই যে রুদ্রেরা নানারকম সংহারপর্বের পর এইরকম ভয়াবহ যৌথ নৃত্যের অনুষ্ঠান করতেন। এঁরাও এই হিমালয় অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। শিব সম্পর্কে তিনটি বড় বড় সংহারপর্ব আছে ;—একটি ত্রিপুরদাহ, অপরটি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ এবং তৃতীয়টি গজাসুর বধ। ত্রিপুরদাহ সম্বন্ধে পুরাণাদিতে একাধিক কাহিনী পাওয়া যায়। মহাভারতের কর্ণপর্বে যে বিবরণটি আছে, সেটিকে অবলম্বন করলে ইতিবৃত্তটি এইরকম দাঁড়ায়।

তারকাসুরের ভীষণ পরাক্রমশালী তিন পুত্র ছিলেন। তাঁদের ঐশ্বর্যও ছিল অপরিমিত। তাঁদের নাকি স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও মর্ত্যে যথাক্রমে কাঞ্চনময়, রজতময়, এবং লৌহময় তিনটি পুরী ছিল। এই তিনটি পুরীর নির্দেশক স্থপতি ছিলেন ময় নামক একজন দানব। এই তিনটি ঘাঁটিতে বহু অসুর সমবেত হয়ে ত্রিলোকের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করতে আরম্ভ করলেন। দেবতারা বহু চেষ্টা করেও তাঁদের নিবারণ করতে না পেরে, অবশেষে শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিবের সেনাপতিত্বে সমগ্র রুদ্র ও দেবসৈন্য ওই পুরীগুলি আক্রমণ করেন এবং শিব নাকি ব্রহ্মাপরিচালিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনটি পুরী ধ্বংসের উদ্দেশ্যে

একটি বাণ নিক্ষেপ করেন। সেই বাণ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে যুগপৎ তিনটি পুরীকেই ধ্বংস করে ফেলে। এই বিপুল কীর্তির পর থেকেই শিব নাকি মহাদেব নামে পরিচিত হন। যুদ্ধকালে রুদ্রসৈন্যেরা নৃত্য করেছিলেন, কিন্তু অসুর-পুরীগুলি ধ্বংস হবার পর শিব কোনও নৃত্যানুষ্ঠান করেছিলেন, এমন উল্লেখ নেই। তবে, ত্রিপুরবিজয় গাথা যে অতি প্রাচীনকালেই রচিত হয়েছিল এবং কিন্নর রমণীরা সেগুলি গাইত, তার উল্লেখ কালিদাস মেঘদূত কাব্যে করেছেন। এই বিষয়টির উপর একটি গম্ভীর নাটক রচিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এটি দেবতারাও প্রত্যক্ষ করেন (নাট্যশাস্ত্র)।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশ সম্বন্ধেও বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন উপাখ্যান দেখা যায়। সবগুলি মিলিয়ে ঘটনাটির এইরকম একটা রূপ দেওয়া যায়।

দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করবার পর শিব সপারিষদ্ হিমবৎ পর্বতে অধিষ্ঠান করছিলেন। একদিন তিনি সতীর সঙ্গে রুদ্রাধিপতির মর্যাদায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁর সভায় বহু দেবতার সমাগম হল। তাঁদের মধ্যে তাঁর শ্বশুর দক্ষও ছিলেন। তিনি এসেছিলেন কন্যাজামাতাকে দেখতে। শিব বা সতী কেউই কিন্তু তখন তাঁদের মহিমান্বিত আসন থেকে উঠে দক্ষকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। দক্ষ এতে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যাজামাতার প্রতি একটা তীব্র ক্ষোভ পোষণ করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে, এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে দক্ষ সকলকেই আমন্ত্রণ জানালেন, কিন্তু সতী বা মহাদেবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। নারদের মুখে পিতা যজ্ঞ করছেন জানতে পেরে সতী তৎক্ষণাৎ পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। সেই সময় শিব গৃহে ছিলেন না, কিন্তু তিনি এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্যও তাঁর তখন ছিল না। একটা বার্তা রেখে তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই নির্ভরযোগ্য অনুচরদের নিয়ে পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। তাঁর আগমনবার্তা যখন ঘোষিত হল তখন দক্ষ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। স্বীয় কন্যাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে তিনি সতীর সম্মুখে তাঁর ছোটবোনদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করলেন অথচ তাঁকে একবারও সম্ভাষণ করলেন না। অপমানিতা সতী পিতাকে এই ব্যবহারের জন্য তীব্র তিরস্কার করলে দক্ষ কঠোরভাবে বললেন যে তাঁর অপরাপর কন্যা জামাতা তাঁদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা তাঁরা শিবের মত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেন না এবং এই কারণেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁর স্বামীকে অবমাননার যোগ্য বলে মনে করেন। সতী এর প্রতিবাদে

সেইখানেই আত্মবিসর্জন দিলেন। এদিকে স্বামীর অগোচরেই পিতৃগৃহে যাত্রা করায় শিব শুধু অসন্তুষ্টই নন বহুল পরিমাণে শঙ্কিতও হয়েছিলেন, কেননা তাঁর আশঙ্কা ছিল এতে একটা অঘটন ঘটবে। সেটা যখন সত্যই ঘটল এবং তিনি যখন জানতে পারলেন কিভাবে সতী দেহত্যাগ করেছেন তখন তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি গণজাতীয় রুদ্রদের সেনাপতি বীরভদ্রকে অসংখ্য রুদ্রসৈন্য সহ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করবার জন্য পাঠালেন এবং নিজে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এই ধ্বংসকার্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। কিন্তু, সতীর মৃতদেহ চোখে পড়ায় তিনি শোকে এত কাতর হয়ে পড়লেন যে যুদ্ধও যেন তাঁর মন থেকে মুছে গেল। কিছুতেই তিনি ঘরে স্থির থাকতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে উন্মত্তের মত পূর্বদিক লক্ষ্য করে ছুটে চললেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা দেখলেন সতীর দেহ যতক্ষণ শিবের কাঁধে রয়েছে ততক্ষণ তাঁর এই উন্মত্তভাব নিবৃত্ত হবার সম্ভাবনা নেই এবং সেই দেহেরও ধ্বংস হবে না। তখন তাঁরা মায়াবলে সতীর শবশরীর চক্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে লাগলেন। যেখানে যে অঙ্গ পড়তে লাগল সেই স্থানই পীঠস্থান বলে গণ্য হল। এইভাবে সেই দেহ সম্পূর্ণ খণ্ডিত হলে নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে ব্যথিত শিব এক জায়গায় বসে পড়লেন। ওদিকে গণসেনাপতি বীরভদ্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে সমগ্র যজ্ঞস্থল মথিত করে যজ্ঞের সমস্ত নিদর্শন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন। বাধাদানকারী দেবতারা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। অবশেষে তাঁরা সকলেই দক্ষকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে শিবের স্তব করতে লাগলেন। শিব দেখলেন যে আর কিছু করবার নেই, যা হবার হয়ে গেছে। তিনি শেষ পর্যন্ত সবাইকে ক্ষমা করলেন। সতী হিমালয় কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিব তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

এই কাহিনীতেও কিন্তু কোথাও শিবের নৃত্যের কথা নেই। যা কিছু বীভৎস হত্যা ও নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা করেছিলেন গণনায়ক বীরভদ্র এবং তাঁর অনুচরবর্গ। অবশ্য লৌকিক কাহিনীতে কল্পনা আরও বিস্তৃততর হয়েছে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে অনবদ্য ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে বলেছেন—শিব নিজেই তাঁর অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন।

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ।

এরই সঙ্গে দক্ষের নিপাত ঘটল।

মৌন ভুণ্ড হেঁট মুণ্ড
মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ
সিংহনাদ ছাড়িছে।

পরের কাহিনী আমাদের জানা। বিধবা শাশুড়ীর মিনতিতে দক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা হল। কিন্তু, সতী অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল।

অতএব, পুনরুজ্জীবিত দক্ষ ছাগমুণ্ডের অধিকারী হলেন। এক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর শিবের আচরিত বিশেষ কোনও নৃত্যের উল্লেখ করেননি, যদিও তিনি বিশিষ্ট পুরাণবিৎ ছিলেন। এই আখ্যায়িকা ও শিবের নৃত্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে বলছি, কারণ নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব প্রসঙ্গে এই ঘটনারই বিশেষ উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে যে মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর সন্ধ্যাকালে, তাল এবং লয় সহকারে বিভিন্ন অঙ্গহার প্রদর্শন করে যে নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন, সেটিই নাকি তাণ্ডবের মূল উপাদান।

বর্তমানে বহুস্থানে শিবের যে নৃত্য তাণ্ডব নামে প্রচলিত আছে, সেটি কিন্তু গজাসুরবধের কাহিনীর পটভূমিকায় পরিকল্পিত। শিব গজাসুরকে বধ করেন। তারপর সেই নিহত অসুরের দেহের চর্ম উচ্ছেদ করে সেই রক্তাক্ত চর্ম হাতে নিয়ে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন। এর উল্লেখও মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীস্থিত মহাকাল মন্দিরের প্রসঙ্গে করেছেন। মেঘদূত কাব্যে অপূর্ব মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনি বলছেন:—

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥

অন্বয়ার্থঃ—হে মেঘ, তুমি সন্ধ্যাকালে পূজার পর পশুপতির নৃত্যারম্ভের সময় তাঁর ঊর্ধ্বপ্রসারিত বাহুর মত বৃক্ষসমূহের অপরদিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করবে এবং সেই সময় অভিনব জবাপুষ্পের মত রক্তবর্ণ সান্ধ্য তেজ ধারণ করে তাঁর শোণিতার্দ্র গজচর্ম ধারণের ইচ্ছাকে হরণ করে। ভবানী উদ্বেগপ্রশমিত স্তিমিত নয়নে তোমার সেই ভক্তি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন।

মল্লিনাথ তাঁর এই শ্লোকের টীকায় এই নৃত্যকেই তাণ্ডব আখ্যা দিয়েছেন। "নৃত্যারম্ভে" শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন—"তাণ্ডবপ্রারম্ভে" এবং পরে বলছেন —"গজাসুর মর্দনান্তর ভগবান মহাদেব তদীয়মার্দ্রাজিনং ভুজমণ্ডলেন বিভ্রৎ তাণ্ডবং চকার—ইতি প্রসিদ্ধিঃ।" এখানেও তিনি কোনও বিশেষ পুরাণের উল্লেখ করেননি—শুধু বলেছেন যে গজাসুরমর্দনের পর ভগবান মহাদেব তাঁর রক্তসিক্ত চর্ম উঁচু করে হাতে ধরে মণ্ডলাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে তাণ্ডব নৃত্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন;—এইরকম জনশ্রুতি বা প্রসিদ্ধি বর্তমান। এও সেই "ম্যাকেবার ডান্স" অর্থাৎ হননোত্তর বীভৎস নৃত্য।

এইবার নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভরতমুনির বিবরণকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে তাণ্ডবের পরিকল্পনা মুখ্যতঃ নাটককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল—একথা স্বীকার করতে হয় এবং এতে সন্দেহ প্রকাশের কোনও হেতু দেখা যায় না। তাণ্ডব কিন্তু নাটকের সব স্তরে. অর্থাৎ বিভিন্ন দৃশ্যগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল না; এর প্রয়োগ হয়েছিল কেবলমাত্র পূর্বরঙ্গে, যেখানে নাট্যের প্রারম্ভে কেবলমাত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের বিধান ছিল। পূর্বরঙ্গে নৃত্যগীতের বিশেষ আয়োজন ছিল। আচার্য ভরত তাঁর ইতিহাসে তিনটি পূর্বরঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। এই তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের পূর্বরঙ্গেই তাণ্ডবের অভিস্থাপনা হয়েছিল। গোড়ার দিকে পূর্বরঙ্গ নেহাৎই পূজাবিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; এর মধ্যে তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক বস্তু ছিল না। এটা যখন একঘেয়ে হয়ে গেল তখন নতুন কিছু প্রযোজনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সময় ভরত কৈলাসে তাঁর দলবল নিয়ে এলেন নাট্যানুষ্ঠান করতে,—উদ্দেশ্য মহেশ্বরকে এই নাট্যকলা দেখাবেন এবং গূঢ়তর উদ্দেশ্য, যদি নটরাজ রুদ্রাধিপতির কাছ থেকে কোনও নতুন প্রস্তাব পাওয়া যায়; কারণ রুদ্রের সঙ্গীতে অভিজ্ঞতার কথা তখন সুবিদিত। ভরতের সঙ্গীত পরিচালক নারদ স্বয়ং গন্ধর্ব ছিলেন, কিন্তু তিনিও রুদ্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নতুন কিছু পাবার আশায়। কৈলাস পর্বতে একটি খুব চমৎকার স্থান বেছে নিয়ে ভরত শিবকে

দেখালেন তাঁর নাটক "ত্রিপুরদাহ"। এর বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। দেখে শুনে মহাদেব অত্যন্ত প্রীত হলেন ; শুধু তাই নয়, একটী নতুন সৃষ্টির জন্যও উদ্‌বুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, নাট্যশাস্ত্রের ভাষাতেই বলি,—

ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং (নৃত্তং) সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা।
নানা করণসংযুক্তৈরঙ্গহারৈর্বিভূষিতম্ ॥

অর্থ :—আমারও মনে হচ্ছে সেই সময়ের কথা যখন সন্ধ্যাকালে আমি নৃত্যানুষ্ঠান করতুম। এই নৃত্যে নানারকম অঙ্গহার এবং করণ সংযুক্ত হয়ে সৌন্দর্য সম্পাদন করত।

মহাকবি কালিদাস মহেশ্বরের এই সান্ধ্য নৃত্যেরই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু, এ নৃত্য নিশ্চয়ই সেই উন্মত্ত প্রেতসম্ভব উদ্দাম অঙ্গবিক্ষেপ নয়,—এ রীতিমত সুশিক্ষিত পরিমার্জিত অভিজাত নৃত্য। অতএব রুদ্রেরা যে বিধিবদ্ধ ললিতকলা হিসাবে নৃত্যের অভ্যাসও করতেন,—ইতিহাসই তার সাক্ষ্য প্রদান করছে।

মহেশ্বর ভরতকে ডেকে বললেন—"তুমি যে নৃত্য আমাকে দেখালে তাকে আমি "শুদ্ধ" নৃত্য বলে স্বীকার করি ; কিন্তু আমি বিবিধ গীতের সঙ্গে যে নৃত্য সম্পাদনের উপদেশ দেব, তাকে "চিত্র" আখ্যা দিলেই শোভন হবে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুচর তণ্ডুকে ডেকে বললেন—"তুমি ভরতকে নৃত্যের অঙ্গহার (অঙ্গবিন্যাস) সম্পর্কে উপদেশ প্রদান কর।" তারপর ভরত তাঁর শাস্ত্রে বলছেন যে—"মহাত্মা তণ্ডু আমাকে যে অঙ্গহার প্রদর্শন করেছেন তার সঙ্গে "করণ" (হস্তপদের যুগপৎ বিন্যাস) এবং "রেচক" (বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গীতে পরিভ্রমণ)—এই সবও আমি এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করব।" এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মুদ্রা নামক যে অঙ্গুলিক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগ ভারতীয় নৃত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তার ব্যবহার ভরতের যুগেও ছিল ; তবে ভরত তদীয় নাট্যশাস্ত্রে এই প্রক্রিয়াকে হস্তাভিনয়ের মধ্যেই নির্দেশ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি অসংযুত হস্ত, সংযুত হস্ত এবং নৃত্যহস্ত (নৃত্তহস্ত)—এই তিন পর্যায়ে লক্ষণ সহ নানাপ্রকার অঙ্গুলিবিন্যাসের রীতিনীতি নির্দেশ করেছেন। তণ্ডু নাকি বত্রিশ রকমের অঙ্গহার প্রদর্শন করেছিলেন ; আর এই অঙ্গহারগুলিকে উপলব্ধি করতে গিয়ে ভরতগোষ্ঠীকে একশো আট রকমের করণ এবং চাররকমের রেচক সম্বন্ধেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন অঙ্গুলিক্রিয়াতেও তাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেন। যে গানগুলি এই নৃত্যের

সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল, সেগুলি প্রধানতঃ তৎকালপ্রচলিত বর্ধমানক এবং আসারিত গীতি। এইগুলিই ছিল সে যুগের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত।

এই সব আঙ্গিকের পরিচয়পর্বে ভগবান শঙ্কর স্বয়ং করণ, রেচক এবং অঙ্গহারগুলি অনুষ্ঠান করে তণ্ডুর সহায়তা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুকুমার নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন পার্বতী। এইসব নৃত্যের সঙ্গে বেজেছিল—মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, ভাণ্ড, ডিণ্ডিম, পণব, দর্দুর, গোমুখ—প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্মনিবদ্ধ তালবাদ্য।

নবলব্ধ এই নর্তনশিল্পের বিস্তৃত বিবরণের পর ভরত আর একবার বলছেন—এই নৃত্য সেই পর্যায়ের যা দক্ষযজ্ঞ "বিনিহত" হলে মহেশ্বর সন্ধ্যাকালে লয়, তাল অনুসারে সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণগুলিতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর শিবের যে শোককাতর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তাতে এই ধরণের নৃত্যানুষ্ঠান যে তৎকালে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে এইটাই মনে হয় যে একটা ঐতিহাসিক সংজ্ঞা প্রদান করবার জন্যই নাট্যশাস্ত্রে শিবের মুখ দিয়ে এই ধরণের উক্তি করানো হয়েছে। আসলে এই নৃত্য রুদ্রের বহুদিনের অভ্যস্ত সংস্কৃতির ফসল, যা উৎসবাদিতে সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হত। হয়তো, সতীবিয়োগের শোকভার অপসারিত হবার পর এই বিজয়োৎসবকে স্মরণ করে এই জাতীয় নৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু সদ্য দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের পর শিবের পক্ষে একটি আর্ট-নৃত্য সম্পাদনের মনোভাব নিশ্চয়ই ছিল না, সেখানে গণসৈন্য অনুষ্ঠিত প্রেতনৃত্যই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে গণ্য হতে পারে। শিব নিজের একক নৃত্যের কথা উল্লেখ করলেও তাণ্ডব হিসাবে যে নৃত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সম্মেলক নৃত্য এবং স্থানে স্থানে পিণ্ডীবদ্ধভাবে অর্থাৎ দু-তিনজনের একত্র সমাবেশে নৃত্যটি বৈচিত্র্যলাভ করেছিল। এইসব পিণ্ডীবদ্ধ অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

নৃত্যের কাঠামোগুলি ঠিক হয়ে গেলে ভগবান শঙ্কর আচার্য তণ্ডুকে এইসব বিধির সঙ্গে উপযুক্তভাবে সঙ্গীত প্রয়োগ করবার নির্দেশ দিলেন। তণ্ডু এই বিশেষ নৃত্যগীতের সমন্বয় সাধন করেছিলেন বলেই নৃত্যক্রিয়াটি তাণ্ডব নামে পরিচিত হয়।

তাণ্ডিনাপি ততঃ সম্যগ্‌ গানভাণ্ড সমন্বিতঃ।
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতি স্মৃতঃ॥

ভরত তৎকালীন প্রচলিত সঙ্গীতের যেসব অংশ নৃত্যে প্রয়োগ করেছিলেন

তাদের মধ্যে কিছু অর্থহীন শব্দের ব্যবহার ছিল। এগুলি নৃত্যের সঙ্গে চমৎকার ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্পাদন করত। পূর্বে যে আসারিত গীতের উল্লেখ করা হয়েছে সেই গীতের প্রারম্ভে ঝণ্টুং ঝণ্টুং প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যোজিত হত। এই উচ্চারণগুলি রুদ্রদের অত্যন্ত প্রিয় এবং এই কারণেই এগুলি বিশেষভাবে সংযোজিত হয়েছিল। আসারিত গীতের এই অংশকে বলা হত "উপোহন"।

যে নৃত্য একদা রুদ্রজাতীয় পুরুষগণই আচরণ করতেন, তার সঙ্গে যুক্ত হল মেয়েদের সুকুমার নৃত্য এবং তাতে আবার শোভনভাবে প্রযুক্ত হল সঙ্গীত। এর নৃত্যভাগটির প্রযোজনা করলেন স্বয়ং শিব, সুকুমার প্রয়োগ করলেন পার্বতী। তারপরে যৌথ প্রচেষ্টায় স্ত্রীপুরুষের পিণ্ডীবদ্ধ প্রক্রিয়া (গ্রুপ বা উপদল অনুসারে নৃত্য) সুসম্পন্ন করা হল। অতঃপর সমস্ত কম্পোজিশনটা শিব স্বয়ং ছেড়ে দিলেন আচার্য তণ্ডুর কাছে সঙ্গীত যোজনা এবং সম্পাদনার জন্য। এ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র বলছেন—

যে গীতিকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যঙ্ নৃত্যবিভাবকঃ।
দেবেন বাপি সম্প্রোক্তস্তাণ্ড্যস্তাণ্ডব পূর্বকঃ॥
গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্যমেতৎ প্রনৃত্যতাম্।
প্রায়েণ তাণ্ডববিধির্দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥

এর অর্থঃ—তাণ্ডবনৃত্যকে পূর্ববর্তী করে দেব শঙ্কর তাণ্ডীকে (তণ্ডুকে) ডেকে বললেন—এই নৃত্যের বিভাজন (এনালাইজ) করে যেখানে যেখানে যেসব গীতিকা সুষ্ঠুভাবে যোগ করা যায়, সেগুলি আগে নির্ণয় কর। তারপরে সেইগুলিকে প্রয়োগ করে এই নৃত্যকে আরও প্রকৃষ্ট নৃত্যে রূপায়িত কর। তাণ্ডববিধি প্রায়শই দেবতার স্তুতিরূপেই নিবেদিত হবে।

এইভাবে যে নৃত্যের সৃষ্টি হল তাই হচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য। বলা বাহুল্য কাজটি সহজে সম্পন্ন হয়নি এবং এর জন্য আচার্য তণ্ডুকে দীর্ঘকাল ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও চিন্তা করতে হয়েছিল। তাণ্ডবের নৃত্যভাগ প্রচলিত ছিল; তথাপি একে নতুন করে সাজিয়ে নিতে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়েছিল তা কেবলমাত্র অতি পরিণত স্রষ্টার মধ্যেই থাকা সম্ভব। এর জন্য নৃত্য প্রযোজকের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু এর সঙ্গে তাল লয়ে সঙ্গতি রেখে গীত ও বাদ্যকে শোভনভাবে যুক্ত করা একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা এবং এর কৃতিত্ব আরও বহুগুণে বেশী, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। অতএব, সমস্ত

কম্পোজিশনটিকে তণ্ডুর নামে পরিচিত করে তাঁকে যথার্থভাবেই মহিমান্বিত করা হয়েছে।

ভরত এবং তদীয় সম্প্রদায় এই বিদ্যাটিকে অধিগত করে কিভাবে নাটকের প্রারম্ভে যোজনা করেছিলেন, অতি সংক্ষেপে তার একটি বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এই যে "চিত্র" নামক অনুষ্ঠান, এটি অভিনয় আরম্ভ হবার আগে মঙ্গলাচরণ হিসাবে সম্পাদিত হত। প্রথমে বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যে কনসার্ট শুরু হত। বাজনা জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আসারিত গীতের প্রয়োগ হত। এই গীতের প্রচুর লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তার রূপায়ণ সম্বন্ধে ধারণা করা এ যুগে সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় ঝণ্টুং ঝণ্টুং ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একজন নর্তকী লীলায়িত ভঙ্গীতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করতেন। বীণায় তখন নানারকমের কলাকৌশল দেখান হত এবং সেই বাজনার স্বর ও ছন্দকে অনুসরণ করে নর্তকীটি কয়েক প্রকার অঙ্গহার সমন্বিত নৃত্য আচরণ করতেন। তারপর তিনি ক্ষণকালের জন্য অন্তরালে গিয়ে অঞ্জলিপুটে পুষ্পপুঞ্জ নিয়ে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতেন। সেটি হয়ে গেলে তিনি রঙ্গ-পীঠের চারদিকে পরিভ্রমণ করে দেবতাদের প্রণাম জানিয়ে আবার কিছুক্ষণ নৃত্য করতেন। এইটি ছিল পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এঁর ভূমিকা এই পর্যন্ত। তিনি প্রস্থান করলে অপরাপর নর্তকীরা অনুরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে পৃথকভাবে একে একে প্রবেশ করতেন। তারপর তাঁরা নানারকম অঙ্গহার প্রদর্শন করতে করতে পিণ্ডীবদ্ধ হতেন। এইরকম যৌথনৃত্যের সঙ্গে চমৎকার বাজনা বাজত। সর্বসমেত চারটি পিণ্ডীবদ্ধ নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে কনিষ্ঠাসারিত, মধ্যমাসারিত, লয়ান্তরিত এবং জ্যেষ্ঠাসারিত—এই চারপ্রকার আসারিত গীত সম্পাদিত হত। পূর্বে যে বর্ধমানক গীতের কথা বলা হয়েছে, তা আর কিছুই নয়, আসারিত গানের অঙ্গসমূহের পরিবর্ধন মাত্র। তৎকালীন মার্গতালগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল,—চচ্চৎপুট, চাচপুট, পঞ্চপাণি প্রভৃতি। এগুলিকে অবলম্বন করে আরও কিছু তাল পরিকল্পিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপক অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হতে সময় নেহাৎ কম লাগত না। বিদগ্ধ দর্শকদের কিন্তু এর জন্য কোনও অভিযোগ তো ছিলই না, বরঞ্চ তাঁরা এই নৃত্যকলাটি সর্বতোভাবে উপভোগ করতেন। লক্ষণ অনুসারে এটি লাস্যনৃত্যের পর্যায়ে পড়ে না।

পরবর্তীকালে কিন্তু এই ব্যাপক পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠান আর আদৌ ছিল না।

সামান্য কিছু নৃত্যানুষ্ঠান যা ছিল তাও একান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এর স্থান দখল করেছিল "প্রস্তাবনা" যাতে নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতির ভূমিকা সংযুক্ত হত। কালিদাস শেষোক্ত কালেরই নাট্যকার।

তাণ্ডবের মোটামুটি পরিচয় আমরা জানতে পারলুম এবং এর মধ্যে মহেশ্বর ও তণ্ডু—এই দুজনের ভূমিকা কতখানি, সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা গেল, কিন্তু এই সঙ্গে একটি প্রশ্নের উদয় হয়, সেটি এই যে—এই তণ্ডু নামক ব্যক্তিটি কে? তাণ্ডব প্রসঙ্গে তিনটি নাম পাওয়া যায়;—তণ্ডু, তণ্ডি এবং তাণ্ডী (তাণ্ডিন্)। পণ্ডিতব্যক্তিদের অনেকের অভিমত ইনি আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত নন এবং এঁর কোনও পরিচয় দিতেও কেউ অগ্রণী হয়েছেন বলে জানি না। ইনি কোন জাতির লোক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা অবশ্য স্বাভাবিক, কিন্তু এঁর পরিচয় যে একেবারেই পাওয়া যায় না তা নয়;—চেষ্টা করলে একটা অনুমান করবার মত সূত্র অন্ততঃ মেলে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উপমন্যু—বাসুদেব সংবাদ একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। এই অধ্যায়ে উপমন্যু বাসুদেব কৃষ্ণকে বলছেন—সত্যযুগে তণ্ডি নামে একজন বিশ্রুত ঋষি ছিলেন, তিনি বহু বর্ষ ধরে মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। এই কঠোর তপানুষ্ঠানের পর মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিলেন,—"তোমার একটি পুত্র হবে। সেই পুত্র অক্ষয়, অব্যয়, দুঃখবর্জিত, যশস্বী, তেজস্বী এবং দিব্যজ্ঞানসমন্বিত হবে। আমার প্রসাদবলে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভিগম্য বেদের সূত্রকর্তা হবে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" এই তণ্ডীপুত্রই সম্ভবতঃ তাণ্ডী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, আর সেই সূত্রই "তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ" নামে সামবেদের প্রধান সূত্ররূপে (সূত্র আর ব্রাহ্মণে তফাৎ এমন বিশেষ কিছু নয়) চলে আসছে। সামবেদের সংহিতাভাগে বিধৃত মূল মন্ত্রগানগুলির উৎপত্তি, ইতিহাস, প্রয়োগ প্রভৃতি তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ও বলে থাকেন। সামগানের ঐতিহ্য যাঁরা ধারণ করে এসেছিলেন, তাঁদের উল্লেখ করতে গিয়ে বংশব্রাহ্মণ "বিচক্ষণ তাণ্ড্য" নামক জনৈক তাণ্ড্যবংশীয় আচার্যের নাম করেছেন। তাছাড়া প্রবচনকর্তা হিসাবেও তাণ্ড্যবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব, এঁরা যে কেবল লৌকিক নৃত্যগীতের চর্চা করতেন তাই নয়, সামগানের ঐতিহ্যকেও সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলেন। বস্তুতঃ সামগায়কদের একটি শাখাকেই তাণ্ড্য-শাখা বলা হয়ে থাকে। তাণ্ড্যসম্প্রদায়কে ভাল্লবী নামক অপর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। এঁদের একসঙ্গে বলা হত "তাণ্ড্যভাল্লবী"।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সংস্করণে পূর্বোল্লিখিত "তণ্ডু" বা তাণ্ডিণ্—এই দুটি নামই পাওয়া যায়। তণ্ডি নামটি কেবল মহাভারতেই দেখা যায়। কিন্তু, তাণ্ডব নামকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যতদূর মনে হয়, গোড়াতে নামটি তণ্ডুই ছিল; সংস্কৃতভাষীরা তণ্ডি নামটি প্রদান করেছিলেন এবং পরে ব্যাকরণসম্মতভাবে এই নামকে "তাণ্ডিণ্" শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। তাণ্ডব নৃত্যকে তাণ্ড্য-নৃত্য বললেও ক্ষতি হয় না, কারণ এরকম উল্লেখও দু এক স্থানে থাকা বিচিত্র নয়। তণ্ডু নামটির ব্যবহার এখনও তিব্বতাঞ্চলে বর্তমান "তোনদ্রুপ" (তথা তোন্দ্রূপ তিব্বতী বানান অনুসরে দন্গ্রুব) নামটি উক্ত অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়। এর অর্থ—"যে তার উদ্দেশ্যকে আয়ত্তে আনতে পারবে," বা—"যে তার পিতামাতার উদ্দেশ্য সাধন করেছে।" আবার, তাণ্ডী বা তাণ্ডিণ্ নামটিও যে নেই তা নয়, —"তাম্‌দ্রিন্" (তিব্বতী বানান অনুসারে-র্তা-মগ্রিন) এক দেবতার নাম, যাঁকে ধ্যান করলে বুদ্ধ যে স্বর্গে অধিষ্ঠান করছেন সেখানে যাওয়া যায়, অথবা মৃত্যুর পর কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে, সেটি আত্মার ইচ্ছা অনুসারে নির্ধারিত হয়।

এই সব লক্ষণ দেখে মনে হয়, অতি প্রাচীন যুগে বর্তমান তিব্বতীদেরই কোনও উপজাতির লোক ছিলেন এই রুদ্রেরা। কৈলাস পর্বত তিব্বতীদের কাছে পবিত্রতম পর্বত। প্রসিদ্ধ তিব্বতী সাধক-কবি তথা গায়ক "মিলা রেপা" এই পর্বতের একাধিক গুহায় ধ্যানধারণায় কাল কাটিয়েছেন। এমন আরও অনেকেই সাধনার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কৈলাস পর্বতের নিম্নদেশ। রুদ্র নামটি বৈদিক, মরুৎ নামটিও তাই, গণ-শব্দও আমরা সংস্কৃত বলেই জানি। এঁদের নিজেদের ভাষায় এঁরা কি নামে পরিচিত ছিলেন, কে বলবে? তথা-কথিত রুদ্রজাতীয় তণ্ডু বা তাণ্ড্যগণ ক্রমে একটি বৃহৎ শাখায় পরিণত হন। এঁরা সম্পূর্ণভাবে বৈদিক ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, তণ্ডিকে তো দ্বিজই বলা হয়েছে। তথাপি এঁদের মধ্যে আদিম বিশ্বাস বা আদিম সংস্কারগুলি সমান-ভাবেই প্রচলিত ছিল, যার ফলে নানা ঘটনায় তাঁদের সেই হিংস্র এবং বীভৎস নৃত্যগুলি ভয়াবহ আকারে আত্মপ্রকাশ করত। সম্ভবত এঁদেরই আর একটি শাখা ছিলেন যক্ষেরা। মহাভারতে অলকায় যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বর্তমান তিব্বতেও তাঁর একটা ক্ষীণ আভাস দেখা যায়। এদের মঠ, মন্দির বা অভিজাত গৃহগুলিতে যেমনি সোনার ছড়াছড়ি দেখা যায়, তেমনি নানা বর্ণের পতাকার ব্যবহার আজও রয়েছে, চিত্রবিদ্যায় দক্ষতাও বিলুপ্ত হয়নি। এমনকি

মহাভারতের যুগে "মণিভদ্র", "মণিমান", প্রভৃতি "মণি" শব্দের যে বহুল প্রয়োগ যক্ষদের নামে দেখা যেত, আজও "মণিপদ্মে হুঁ" শ্লোগানে সেটি রক্ষিত আছে। আমরা ভারতীয়েরা যেমন যুগ যুগ ধরে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাচীনতম ধর্ম-সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ কণামাত্র প্রচলিত রাখতে পেরেছি, তেমনি এঁরাও ঠিক একই ভাবে খুব সামান্য বৈশিষ্ট্যই বর্তমানে রক্ষা করতে পেরেছেন।

যাই হোক এ সবই অনুমান মাত্র। তবে, এরমধ্যে যেটি সত্যি সেটি হল এই যে, তাণ্ডব নামক নৃত্যটি সুপ্রাচীন রুদ্রজাতির একটি বিশিষ্ট নৃত্যের ঐতিহ্য বহন করে। যে তণ্ডু এই নির্দিষ্ট আকারটি প্রণয়ন করেছিলেন তিনি যদি শিবের সমসাময়িক নাও হয়ে থাকেন, তাহলেও এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, শিবের ঐতিহ্যের সঙ্গে যে নৃত্য যুক্ত হয়ে এসেছিল তাকেই তিনি একটি সম্পূর্ণ নতুন আর্টে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাণ্ডব সম্বন্ধে আর একটি ধারণা থেকে আমাদের অব্যাহতি পেতে হবে। এই নৃত্য কেবলমাত্র পুরুষদের আচরিত নৃত্য নয় এবং এর প্রকৃতিও উদ্ধত ছিল না। যিনি যাই বলুন না কেন, ইতিহাস এবং সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তাণ্ডব একটি সুললিত নৃত্য, যার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নর্তনলীলার পরিচয় প্রদান করতেন। আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উচ্চ শ্রেণীর স্বর, তাললয়যুক্ত গীতবাদ্য ব্যতীত তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হতে পারে না। নৃত্যে সঙ্গীতের প্রয়োগই তাণ্ডবের মূল বৈশিষ্ট্য। ভরত যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তাকে পৌরাণিক বলে মনে করলেও এই সত্যই স্বীকার করতেই হবে যে তিনি যে নৃত্যধারাকে নাটকে মঙ্গলাচরণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, সেটিই তৎকালে তাণ্ডববিধি নামে পরিচিত ছিল।

পরিশেষে, আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। দু-একজন মহামান্য দার্শনিক ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা বা ভাষ্য রচনা করে গেছেন। এঁদের নিজেদের কয়েকটি ব্যক্তিগত মতবাদ ছিল এবং অনুবর্তীদের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁরা ব্যাখ্যার নামে ভরতের সুস্পষ্ট এবং সহজ মতবাদকে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করে গেছেন এবং একাধিক বিষয়ে এক একটা নতুন তত্ত্বের আমদানি করেছেন যার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁদের নিজস্ব। এঁদের মধ্যে মুখ্যতঃ অভিনবগুপ্তের নাম করতে হয়। নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর নিজের মতবাদকে স্থাপন করতেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। ফলে, রস থেকে আরম্ভ করে বহুতত্ত্বই এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যে ভরতের মতবাদ গুরুতর-